দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

লড়াই একটি
মুখের সঙ্গে
হাজার মুখোশের
পৃঃ ২৭

যা কিছু
তৃণমূলের বিপক্ষে
তাই বিজেপির পক্ষে
পৃঃ ২৩

৭১ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ২৫ মার্চ ২০১৯।। ১০ চৈত্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

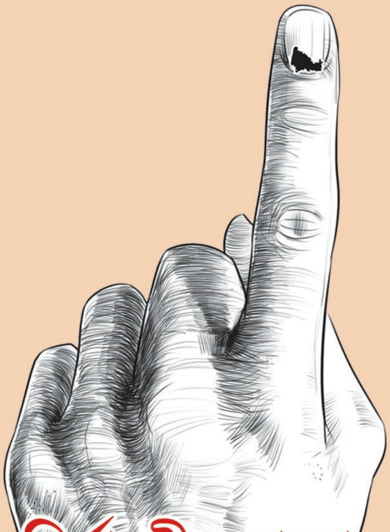

নির্বাচনী মহারণ
২০১৯

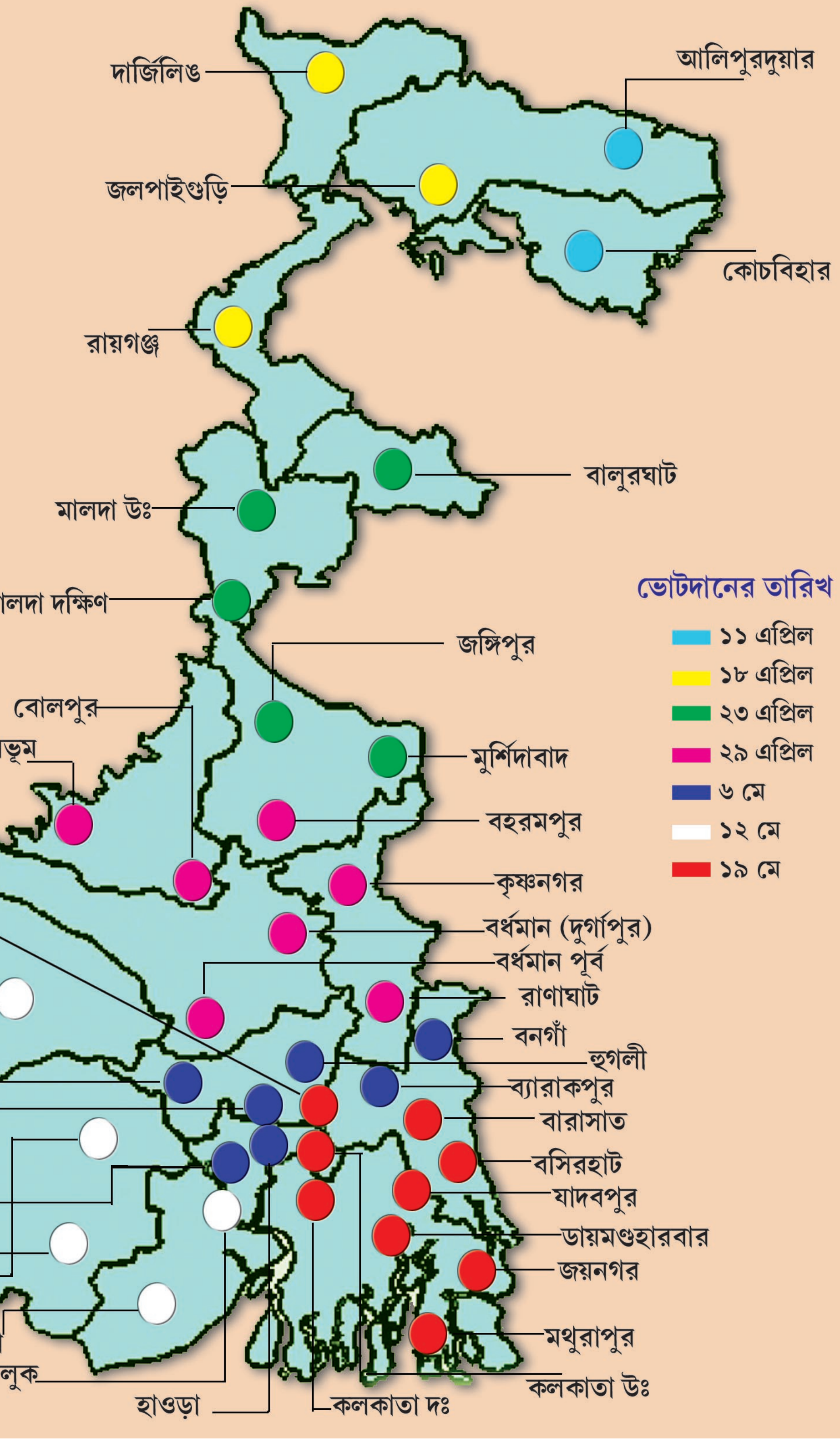

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ১০ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৫ মার্চ - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বিরোধীদের সৌজন্যেই দেশপ্রেমের ফলিত প্রয়োগ এই নির্বাচনে ▯ ৬

খোলা চিঠি : বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

অন্ধ মোদী বিরোধিতার নামে পাকিস্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন বিরোধীরা ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৮

লোকসভা নির্বাচনে ইভিএমেই হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ লড়াই ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১০

বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৩

ভারতীয় পরিবার প্রথাকে মূল্যবোধকেন্দ্রিক করে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে : আর এস এস ▯ ১৫

কৃষিপ্রণালীর প্রযুক্তি প্রয়োগে সুন্দরবনের জনজাতি চাষিদের জীবন-জীবিকা ও উন্নতি ▯ সৌমিক বিশ্বাস, ড. মানবেন্দ্র রায় ▯ ১৭

যা কিছু তৃণমূলের বিপক্ষে তাই বিজেপির পক্ষে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

পঞ্চান্ন বছরের থেকে এগিয়ে থাকবে পঞ্চান্ন মাস ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৫

লড়াই একটি মুখের সঙ্গে হাজার মুখোশের ▯ সনাতন রায় ▯ ২৭

কোন্নগরের দেবী রাজরাজেশ্বরী ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ৩১

সর্বজনীন মিলন উৎসব দোল ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩২

কুম্ভের ভাঙা হাটে ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ৩৫

দেশভক্তির পুনর্জাগরণ ▯ তরুণ বিজয় ▯ ৩৭

মমতা ব্যানার্জির প্রতিটি পদক্ষেপ স্বৈরাচারের পদধ্বনি ▯ সুজাত রায় ▯ ৪৩

মোদী বিরোধিতায় তৃণমূল সাংসদরা সংসদে নীরব ছিলেন কেন ▯ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪১▯ অন্যরকম : ৪২ ▯ স্মরণে : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১ এপ্রিল ২০১৯

প্রকাশিত হবে ১ এপ্রিল ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এবার কি তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে?

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গেছে। প্রতিটি দল এখন ঘর গোছানোয় ব্যস্ত। কিন্তু ঘর কতটা সুরক্ষিত? বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হয়নি। আলাদা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটি দল। ফলে এবার মুসলমান ভোট তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের মধ্যে ভাগাভাগি হতে পারে। তাতে কার লাভ? কারই বা ক্ষতি? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় : এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুড। সেখান থেকে অবধারিতভাবে উঠে আসবে একটি প্রশ্ন : এবার কি তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে? উত্তর খুঁজবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সনাতন রায়, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশের মানুষ স্বার্থান্বেষীদের চাহে না

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন দরজায় করাঘাত করিতেছে। সমগ্র দেশে ১১ এপ্রিল হইতে লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হইবে। চলিবে ১৯ মে পর্যন্ত। সাতদফায় ভোটগ্রহণের পর ফলাফল প্রকাশিত হইবে ২৩ মে। এই বারের নির্বাচনেই নির্ধারিত হইবে ভারত রাষ্ট্র কি অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং অখণ্ডতার আদর্শকে অটুট রাখিতে পারিবে, নাকি, ভারত আবার পরার্থলোভী, ব্যক্তিস্বার্থ এবং পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী আদর্শহীন কতিপয় ভ্রষ্ট রাজনীতিকের করতলগত হইবে। ভারতীয় জনগণ এইবার এই মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। তাহাদেরই স্থির করিতে হইবে, তাহারা কাহার হস্তে দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে চান। সমগ্র দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এইবারের লোকসভা নির্বাচন আরও একটি কারণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর মাত্র দুই বৎসর পরে এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। তাহার পূর্বে এইবারের লোকসভা নির্বাচনটিকে কার্যত একটি সেমি ফাইনালের আখ্যা দেওয়া চলে। এইবারের লোকসভা নির্বাচনেই প্রমাণ হইবে, জনমত কোন খাতে প্রবাহিত হইতেছে।

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে সমীক্ষাগুলি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, দেশের জনগণ আগামী পাঁচ বছরের জন্য নরেন্দ্র মোদীকেই আরও একবার প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখিতে চাহেন। সমীক্ষকদের মতে নির্বাচনী দৌড়ে নরেন্দ্র মোদী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপেক্ষা কয়েকশত কদম আগুয়ান হইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী পক্ষ, বিশেষত কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী যতই মিথ্যা প্রচারে গগন বিদারিত করুন বা কুৎসার ঝাঁপি খুলিয়া বসুন না কেন, দেশের নির্বাচকমণ্ডলী এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন, নরেন্দ্র মোদীর হস্তে দেশ যতখানি সুরক্ষিত, অন্য কাহারো হস্তে ততখানি নয়। তদুপরি, ইহাও দেশবাসীর বুঝিতে বিলম্ব হইতেছে না যে, নরেন্দ্র মোদী স্বার্থান্বেষীদের মৌচাকে ঢিল ছুঁড়িয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে এত বিষোদ্গার। ইহাও সকলেই বুঝিতেছেন যে এই স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে কোনও কোনও বিদেশি শক্তি সক্রিয় আছে, যাহারা ভারতকে দুর্বল দেখিতে চাহে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী দেশপ্রেমিক। তাঁহারা দেশের ক্ষতি হয়, এমন কোনও সিদ্ধান্তের সমর্থক হইবে না। পুলওয়ামায় কেন্দ্রীয় জওয়ানদের উপর পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলার পর ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনোভাব বুঝাইয়া দিয়াছে, দেশবিরোধী কোনও চক্রকেই তাহারা ক্ষমতার অলিন্দে আর দেখিতে চাহে না। বরং, তাহাদের পছন্দ প্রকৃতই জাতীয়তাবাদী এক রাষ্ট্রনায়ক।

এইবার সমগ্র দেশে সাত দফায় নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত করিতে চলিয়াছে নির্বাচন কমিশন। সাত দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্য একটিই। তাহা হইল নির্বাচনকে যতটা সম্ভব সুষ্ঠু এবং অবাধ করা। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের কথা চিন্তা করিলে বলিতেই হয়, নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক এবং সময়োপযোগী। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছে, নির্বাচনকে কীরূপ প্রহসনে পরিণত করিয়াছিল রাজ্যের শাসক দল। পশ্চিমবঙ্গবাসী ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সন্ত্রাসকে কোন মাত্রায় লইয়া যাইতে পারে শাসক দল। ফলত, পশ্চিমবঙ্গবাসীর আশা, লোকসভা নির্বাচনের সময় তাহাদের ভোটদানের অধিকারটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে— তাহার প্রতি যত্নবান হইবে নির্বাচন কমিশন। আশা করাই যায়, পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশন পূরণ করিবে।

সুভাষিতম্

একোহহম অসহায়োহং কৃশোহহম অপরিচ্ছদঃ।

স্বপ্নেহপি এবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে।। (নীতিশাস্ত্র)

আমি একা, অসহায়, দুর্বল এবং বন্ধুহীন—এরকম চিন্তা সিংহ স্বপ্নেও কোনওদিন করে না।

বিরোধীদের সৌজন্যেই দেশপ্রেমের ফলিত প্রয়োগ এই নির্বাচনে

বিশ্বামিত্র

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বড়ো যে ইস্যুটি হতে চলেছে তা অবশ্যই দেশপ্রেম। বলা বাহুল্য, বিগত পাঁচ বছর ধরেই এই ইস্যু আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে। এই শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে ভাত জোটানোই যেখানে বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ, সেখানে দেশপ্রেমের কূট তর্ক তুলে লাভ কী— এমন প্রশ্ন আকছার শুনতে হয়। দেশপ্রেমের সংজ্ঞা নির্ধারণেও নানান ধোঁয়াশা, অনেক ধরনের প্রশ্ন ওঠে— দেশ বলতে ভৌগোলিক সীমানাই কেবল বোঝায় কিনা, দেশপ্রেম মানে সীমান্ত প্রেম কিনা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে মারাত্মক প্রশ্নটি হলো— বিজেপিই দেশেপ্রেমের একমাত্র হকদার কিনা, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করলেই তাকে দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া যায় কিনা— এহেন বিভিন্ন প্রশ্ন বিগত কয়েকবছরে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু যাঁরা এই প্রশ্নগুলি তোলেন, মুখোশের আড়ালে তাঁদের প্রকৃত মুখমণ্ডলের ছবি দেশবাসী এতদিনে নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছেন। একথা স্বীকার করে নিতে কোনও দ্বিধা নেই যে, কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির চরম বিরোধী হলেই কেউ দেশদ্রোহী হয়ে যায় না। কিন্তু মোদী বিরোধিতার রাজনৈতিক স্বার্থ ও তাগিদ যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন বিরোধীরা খেয়ালও করে দেখেন না, সেটা কখন যেন দেশ বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। বালাকোটে সেনা অভিযানের সাফল্য অবশ্যই বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, সমগ্র দেশবাসীরই তাতে গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু বিরোধীরা প্রশ্ন তুললেন ‘মানুষ’ (‘জঙ্গি’ নয়) মরেছে, নাকি খালি গাছপালাই ধ্বংস হয়েছে।

রয়টার্সের একটা রিপোর্টকে তাঁরা হাতিয়ার করলেন, যেখানে বলা হয়েছে, বালাকোটে কেউ নিহত হয়নি। একজন সামান্য আহত। প্রশ্ন হলো, রয়টার্সের প্রতিনিধি জানলেন কী করে। তাদের প্রতিনিধির সরেজমিন অনুসন্ধান যে আদতে ভাঁওতাবাজি তা বোঝা যায় যখন দেখি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের কোনো প্রতিনিধিকেই বালাকোটে ঢুকতে দিচ্ছে না পাকিস্তান, জঙ্গি-মৃতদেহগুলি পাছে তাঁরা দেখতে পান। এদেশের বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা এসব জানেন না তা নয়, তবু বালাকোট তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায় না। তাঁরা বরং প্রশ্ন তোলেন পুলওয়ামার ঘটনা জেনেশুনে বিজেপি সরকার ঘটায়নি তো, উগ্র জাতীয়তাবাদের হাওয়া তুলতে!

সোশ্যাল মিডিয়ায় এর চমৎকার জবাব পাওয়া গিয়েছে— ১৯৮৪ সালে রাজীব কি ইচ্ছাকৃতভাবে মা ইন্দিরাকে হত্যা করেছিলেন ভোটে ফয়দা তুলতে, নাকি ১৯৯১ সালে কংগ্রেস চক্রান্ত করে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করে ভোটে ফয়দা তুলেছিল? আসলে গত পাঁচ বছরে বিরোধীদের কার্যকলাপ মোটামুটিভাবে জে এন ইউতে আফজল গুরুর জন্মদিন পালন দিয়ে শুরু, মাঝে উরি ঘুরে সাম্প্রতিকতম পুলওয়ামা, বালাকোট বিরোধীদের চেহারা সর্বসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছে। সেনাকর্তারা বলে দিচ্ছেন মনমোহন সরকার বায়ুসেনাকে নিয়ন্ত্রণরেখা টপকানোর অবাধ হস্ত দেননি, মোদী দিয়েছেন, তাই এই সাফল্য।

বিরোধীদের মেন্টরদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ইন্টেলেকচুয়াল শক্তি জোগান ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, শঙ্খ ঘোষ, অমর্ত্য সেন, রজতকান্ত রায়ের মতো লোকেরা, তাঁরা কোন মতাদর্শের তা জানতে কারো বাকি নেই। আর রাজনৈতিক আইনি শক্তি জোগাচ্ছেন কপিল সিবাল, সলমন খুরশিদ, দ্বিগ্বিজয় সিংহের মতো আদ্যন্ত দেশবিরোধীরা যাদের দেশদ্রোহিতার অনন্য সব নজির রয়েছে। বিরোধীদের মোদী বিরোধিতায় তাই দেশ-বিরোধী চিৎকার থাকবেই। মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানে এঁদের অকৃত্রিম প্রয়াস যেমন মুসলমান তোষণ ও হিন্দু বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিল, গত পাঁচ বছরে এই বিষয়গুলিই আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ভারত-বিরোধিতা, পাকিস্তান-প্রেম, সর্বোপরি আর এস এস বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে। এই রাজনৈতিক বাস্তবতাই আজ সন্ত্রাসবাদ পরিপোষণেও এদের উৎসাহিত করেছে। দেশপ্রেমের নিন্দায় এঁরা কেবল নিজেদের ‘দ্বেষপ্রেমী’ই করে তোলেননি, দেশদ্রোহীতেও পরিণত হয়েছেন।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নবান্ন, হাওড়া
দিদি,

খুব ভয় করছে। সত্যি বলছি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি বড্ড ভয় দেখাচ্ছে। আরও বেশি করে উদ্বেগের জন্ম দিল বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাটা। এটাকে পুলিশি সাফল্য বলব, না কি ব্যর্থতা, তাও ভাবতে হচ্ছে বার বার। ভোটের মরশুমে এক রাশ প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দিয়ে গেল।

সম্প্রতি কলকাতার টালা ব্রিজ থেকে একটা মিনি ট্রাককে পুলিশ আটক করেছে, যাতে এক হাজার কেজি পটাশিয়াম নাইট্রেট ছিল। বিস্ফোরক তৈরির এই উপকরণ নাকি ওড়িশার বালেশ্বর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল এবং উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে।

প্রথম প্রশ্ন হলো, ওড়িশার বালেশ্বর থেকে কলকাতা পর্যন্ত দীর্ঘপথ এল কী করে এত পরিমাণে বিস্ফোরক তৈরির উপাদান বোঝাই মিনি ট্রাক? পুলিশি বন্দোবস্ত বা গোয়েন্দা তৎপরতার পরিস্থিতিটা তাহলে কী রকম? ভিন্ রাজ্য থেকে বাংলায় ঢোকা গাড়িগুলোর ঠিকমতো তল্লাশি কি তা হলে হচ্ছে না? নজরদারির কি বড়সড় অভাব রয়েছে? নাকি সব জেনেশুনে। প্রাক ভোট প্রস্তুতি! সেটা যদি হয় তবে দিদি ভয় তো লাগবেই।

পুলওয়ামার মতো ভয়ংকর জঙ্গি হামলা ঘটে যাওয়ার পরেও কি আমরা যথেষ্ট সতর্ক হতে পারছি না? আমরা সেনাবাহিনীর সতর্কতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি, কিন্তু সেটা ছিল জঙ্গি হানা। অতর্কিতে হানা। আর এ তো নির্ভয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি! যদি সতর্ক থাকত পুলিশ, তাহলে দেশের মধ্যে এতটা দীর্ঘপথ কী ভাবে পাড়ি দিত বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ বোঝাই ট্রাক?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, একটা ঘটনা তো চোখের সামনে এল, অলক্ষ্যেই এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটে যায়নি তো? দেশের মধ্যে এতটা দীর্ঘপথ যে ভাবে পাড়ি দিয়েছে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটা, তাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকরগুলো সামনে চলে এল অনেকখানি আশঙ্কা জাগিয়েই। একটা ট্রাক ধরা পড়েছে কিন্তু সবার অজান্তে আরও কত ট্রাক বোঝাই বিস্ফোরক বাংলার অলিতে গলিতে ঢুকে পড়েছে বা পড়ছে বা পড়বে।

খবরের কাগজে যা পড়লাম তাতে, ভোটের আগে বোমা তৈরির জন্যই ওই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উত্তর ২৪ পরগনায়। এমনটাই নাকি জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। অতএব তৃতীয় প্রশ্ন হলো, শুধু কি উত্তর ২৪ পরগনা? না কি জেলায় জেলায় ভোটের আগে এই একই প্রস্তুতি চলছে? বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যে বিস্ফোরক পৌঁছে গিয়েছে, এমন নয় তো? সে রকমটা যদি ঘটে গিয়ে থাকে, তা হলে বারুদের স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে যেতে হবে বাংলাকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেক প্রাণ দিতে হয়েছে বাংলাকে। সাধারণ নির্বাচনেও সেটা হবে না তো!

প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ যা বলছে, তা কিন্তু উদ্বেগজনক পরিস্থিতির আভাস দিচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলা কীভাবে উত্তপ্ত হয়েছিল, তা আমরা সবাই দেখেছি। যে, উত্তর ২৪ পরগনায় এই বিস্ফোরক যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের আগে থেকে শুরু করে নির্বাচনের অনেকগুলো মাস পরেও সেই জেলার কোনও কোনও অংশে কীভাবে বোমা-বন্দুকের গর্জন শোনা গিয়েছে, তাও আমরা জানি। লোকসভা নির্বাচনেও কি সেই ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটানোর প্রস্তুতি চলছে তা হলে?

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আরও একবার সাধারণ নির্বাচনে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের মধ্যে থেকেই অনেক শক্তি এই প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা যে করবে, তা আমাদের অজানা নয়। নানা অগণতান্ত্রিকতাকে আশ্রয় করে, হিংসায় সওয়ার হয়ে গণতন্ত্রের শিলমোহর আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা এ দেশের নানা প্রান্তেই দেখা যায় নির্বাচনে। কিন্তু পরিণত গণতন্ত্রে সেসব মোটেই কাম্য নয়। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষিত হওয়ার কয়েক দিন আগেই সম্ভাব্য হিংসার প্রস্তুতির খানিকটা আভাস আমরা পেয়ে গেলাম।

এ রাজ্যে যে এমনটা হতেই পারে সেটা গোটা দেশই জানে। তাই তো নির্বাচন কমিশন মাত্র ৪২টা আসনের জন্য সাত দফায় ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিদি, আপনি তাতে ক্ষুব্ধ। এক সময়ে আপনিই বেশি দফায় ভোট চাইতেন। আর আপনিই বেশি দফার ভোট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। আপনার একান্ত অনুগত ভাই হিসেবে সত্যিই আপনাকে মাঝে মাঝে একদম বুঝতে পারি না। এটাই কি পরিবর্তন। এটাই কি 'বদলা নয়, বদল'?

— **সুন্দর মৌলিক**

অন্ধ মোদী বিরোধিতার নামে পাকিস্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন বিরোধীরা

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

জাতীয় আপতকালীন কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত বিরোধীদের মতৈক্যের ভিত্তিতে যদি শত্রুর মোকাবিলা করতে হয় সেক্ষেত্রে ভারত নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবে। এই বিষয়টা আবার বিশেষভাবে সত্যি হয়ে ওঠে যদি সেই সময় দেশে সংসদীয় নির্বাচন দোরগোড়ায় এসে যায়। নির্বাচনী মরশুমে সব দলই মনে করে তাদের হয়তো বড়ো সুযোগ রয়েছে। আপতকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মূল দায় যেহেতু ক্ষমতাসীন সরকারের হাতে থাকে এখানকার বিরোধী দল চায় সরকার ভুল করুক। তারা এমনটাও প্রত্যাশা করে যে সরকার নিষ্কর্মা থাকুক বা কিছু করলেও যেন ভুলের ফাঁদে পড়ে যায়।

বিরোধীদের একগুঁয়েমির কারণ কিন্তু শুধুমাত্র এই নয় যে নরেন্দ্র মোদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি বহু মানুষকে নিজের পক্ষে টেনে এনে সফল মেরুকরণ করতে পারেন। তাঁর আগের অনেক প্রধানমন্ত্রীই যা করতে অক্ষম ছিলেন। বেশিদিনের কথা নয় অনেকেই একটু স্মৃতি হাতড়ালে মনে করতে পারবেন ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের সময় বিরোধীপক্ষ কিন্তু মন খুলে সরকারের পাশে দাঁড়াতে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। সে সময় অটলবিহারী বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল ছিল। সামনেই নির্বাচন। মুখে না বললেও এটা বোঝা গিয়েছিল যে বিরোধীরা মনে মনে ভাবছেন যে কারগিলের ওই খাড়া পর্বতচূড়োর মাথায় বসে থাকা পাকিস্তানি হানাদারদের তাড়াতে সরকার ব্যর্থ হবে।

তাঁদের আশা আর একটু শক্তিমান হয়ে ভাবছিল যে সরকারের সামরিক ব্যর্থতা আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির হাওয়া কেড়ে নেবে। যদি তিনি ব্যর্থ হতেন সেক্ষেত্রে তিনি লাহোরে যে শুভেচ্ছা বাসযাত্রা করেছিলেন তারও মূল ধরে টেনে তাঁকে সরাসরি কাঠগোড়ায় তোলা হতো। অনায়াসে তাঁকে হেয় করে বলা হতো দেশের সেনাবাহিনীর ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তিনি শত্রুকে লাহোরে গিয়ে আলিঙ্গন করছেন। একই সঙ্গে বিজেপির জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি ফুটো হয়ে যেত। ঠিক তাই প্রতিপন্ন করার জন্য যুদ্ধ চলাকালীন পুরো সময় কংগ্রেস মুখপাত্ররা দেশের গুপ্তচর সংস্থার ব্যর্থতা ও সেনাবাহিনীর যুদ্ধ মোকাবিলায় অপ্রস্তুতি নিয়ে সরকারকে কুটিল আক্রমণ করে যেতে থাকে। ভুললে চলবে না এই সময় আরও এক কাঠি এগিয়ে সোনিয়া গান্ধী বাজপেয়ীকে মিথ্যেবাদী বলতেও পেছপা হননি। ঠিক এই অভিযোগই তাঁর ছেলে এখন মোদীর বিরুদ্ধে করে যাচ্ছেন। শতাব্দী শেষের সেই বছরে গোটা দেশ একযোগে সরকার ও সেনাবাহিনীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐকমত্য অধরাই ছিল।

> **মোদীর প্রতি অন্ধ ঘৃণা পোষণ করতে করতে কালক্রমে তাঁরা নিজেরাই বোধবুদ্ধি অন্ধ করে ফেলেছেন। তাদের কাছে মোদীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার গুরুত্বের কাছে বাকি কোনো কিছুরই মূল্য নেই। আর এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে যে কোনো হীন কৌশল অবলম্বনেও কুছ পরোয়া নেই।**

এখন দেখতে হবে পুলওয়ামা আর বালাকোটের ঘটনা ১৯৯৯-এর সময় থেকে কতটা আলাদা। উত্তর অতি সহজ। আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর ভয়াবহ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ীভাবে বিরোধীরা সরকারকে প্রয়োজনমতো কাজ করার ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছিল। এই সংহতি ও ঐকমত্যের আয়ু ছিল মেরেকেটে ৪৮ ঘণ্টা। এর পরই মমতা ব্যানার্জি বলে উঠলেন যে সরকার কী করে তড়িঘড়ি নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে যে পাকিস্তানই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। দেরি করেনি কংগ্রেসও। বরাবরের মতো গুপ্তচর সংস্থার ব্যর্থতা নিয়ে সরকারের ওপর আক্রমণ শাণিয়েছে। কংগ্রেসের ভাবটা এমন যেন আতঙ্কবাদী গোষ্ঠীরা সবসময়ই ছাঁকনি দিয়ে কঠিন আর তরল পদার্থ ছেঁকে আলাদা করার মতো গুপ্তচর সংস্থার জন্য ঝাড়াই বাছাই করে কিছু খবর ছেড়ে যায়। কী কার্গিল কী পুলওয়ামা উভয়ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রারম্ভিক কিছু হম্বিতম্বির পর সরকার ভয়ংকর রেগে গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকবে। পুলওয়ামায় আক্রমণ ও বালাকোটে

প্রত্যাঘাতের অন্তর্বর্তীকালীন ১২ দিন অহোরাত্র মোদীকে তুমুল বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বারবার তাঁর ৫৬ ইঞ্চি ছাতির প্রসঙ্গ তুলে কুৎসিত আক্রমণ করা হয়েছে।

একথা বলতে আজ কুণ্ঠা থাকা উচিত নয় যে বালাকোটে জইশ-ই- মহম্মদের শিবিরের ওপর তুমুল বোমাবর্ষণ জাতীয় পরাক্রমেরই নিদর্শন, একইসঙ্গে এক আড়ম্বরময় প্রত্যাঘাত। এটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এক অভিযান কেননা পাকিস্তান পাল্টা জবাব আশা করে সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিশ্চয় নিয়েছিল। আচম্বিতে, তীব্র গতিতে ও অসামান্য নৈপুণ্যে এই অভিযান ১০০ শতাংশ সফল করার জন্য দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাপ্য। কিন্তু গভীর আক্ষেপের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় এই অভিযানকেও পঙ্কিল বিতর্কের পরিসরে নামানো হচ্ছে।

একটা বিতর্ক এ বিষয়ে অনায়াসে চলতে পারে, ভারতের নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসীদের পাকিস্তানে অবস্থিত শিবিরগুলির ওপরই হামলা চালানো? উচিত না কি সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিহত করতে তাদের ধাওয়া করে পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডের যেখানে ঢোকা প্রয়োজন সেখানেও ঢোকা উচিত? ভারতের এযাবৎ অবলম্বিত কৌশলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে আক্রমণের সঙ্গে পাকিস্তানের আদি আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে আক্রমণ দুটোই বিবেচনায় রাখতে হবে। এ বিষয়ে দেশের বিরোধীদের মত দ্বিধা বিভক্ত। একটা অংশ চাইছে পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধ হোক, আর এক দল বলছে শুধুমাত্র কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর চেষ্টাই শ্রেয়। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুচিন্তিত দৃঢ় অবস্থানের বিপরীতে কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ বিরোধী তত্ত্ব উঠে আসছে না।

এখন সত্যিই যদি মোদী সরকারের বিকল্প কোনো মহাগটবন্ধন সরকার উদিত হয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতায় তাদের নীতি তো আগাগোড়া বিভ্রান্তিমূলক। কেবল একটা বিষয়ে তাদের অন্ধ বিশ্বাস, এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী যা যা ব্যবস্থা নিয়েছেন তার সবই নিশ্চিতভাবে ভুল।

কতজন সন্ত্রাসবাদী বালাকোট বোমাবর্ষণে মারা গেছে বা বাড়িগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে না কেন, এসবই যুদ্ধকালীন বা ওই সময়ে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের বিশদ তথ্য। সরকার কখনই এগুলি প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। বিশেষ ধরনের অভিযানের ক্ষেত্রে যেমন পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন সেনা যেটা করেছিল সেই সতর্কতা অবলম্বনকে অলিখিত নিয়মাবলী বলে ধরে নেওয়া হয়। মার্কিনী পরিকল্পনা তিলমাত্র অনুমান করতে পারলে গুপ্তচর সংস্থাগুলি দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠে ব্যাপক পাল্টা এলোপাথাড়ি নরহত্যায় নেমে পড়তে পারত। এ ঝুঁকি থেকেই যায়।

কিচ্ছু অগ্রিম টের না পাওয়ার ব্যর্থতায় পাকিস্তান এখন মরীয়া হয়ে বোঝাতে চাইছে বালাকোটের আক্রমণ সর্বৈব মিথ্যে। ভারতের তরফে চূড়ান্ত অপপ্রচার। ওখানে যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল বা বোমাবর্ষণে তাদের কেউ কেউ হতাহত হয়েছে এটা কাগজে কলমে স্বীকার করলেই সঙ্গত প্রশ্নটা উঠবে যে পাকিস্তান তাহলে নিশ্চিতভাবে জিহাদি ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ মদতদার। তাদের দেশকেই জিহাদিদের লঞ্চপ্যাড হিসেবে তারা ব্যবহার করতে দেয়। আজকে অস্বীকার করা আর নির্লজ্জ মিথ্যে বলা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো বিকল্প অবশিষ্ট নেই। অবশ্য হতাশ ইমরান খানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার হুমকি অক্ষমের আস্ফালন। তাতে কিন্তু কেউই কান দিচ্ছে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের এক শ্রেণীর বিরোধীপক্ষ ও ভারতের বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে পাকিস্তানের মিথ্যে প্রচার ডিপার্টমেন্টের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে চলেছেন। তারা কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেশবিরোধী নয়। মানসিকভাবে অনেকেই দেশপ্রেমিক। কিন্তু মোদীর প্রতি অন্ধ ঘৃণা পোষণ করতে করতে কালক্রমে তাঁরা নিজেরাই বোধবুদ্ধি অন্ধ করে ফেলেছেন। তাদের কাছে মোদীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার গুরুত্বের কাছে বাকি কোনো কিছুরই মূল্য নেই। আর এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে যে কোনো হীন কৌশল অবলম্বনেও কুছ পরোয়া নেই।

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

উত্তর সম্পাদকীয়

লোকসভা নির্বাচনে ইভিএমেই হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ লড়াই

সাধন কুমার পাল

স্বাধীনতার সাত দশক পর জন্ম নিল নতুন ভারত। উরি হামলার জবাব দিতে ভারতীয় সেনার লেগেছিল ১০ দিন। পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাত করতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় নিল বায়ুসেনা। ২৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ভোরবেলা বালাকোট সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে জইশ-ই- মহম্মদের আলফাও কন্ট্রোলরুম ও প্রশিক্ষণ শিবির ধ্বংস করে ওই শিবিরে অবস্থানরত কমপক্ষে ৩৫০ জন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করে ৪৪ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর বদলা নিল।

২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোরবেলা সকালে চারটি পাক যুদ্ধবিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকে পড়লে তাদের তাড়া করছিলেন উইং কমান্ডার অভিনন্দন। মিগ-২১ বিমান নিয়ে পাকিস্তানের এফ-১৬ বিমান ধাওয়া করতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন পাকিস্তানের আকাশে। বিমানটিকে গুলি করে নামায় পাক সেনা। জীবন বাঁচাতে প্যারাসুটে ঝাঁপ দেন অভিনন্দন। হাওয়া অনুকূলে না থাকায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের মাটিতে নেমে বন্দি হন পাকসেনার হাতে। পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি অভিনন্দনের মুক্তির জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কথা বলার আগ্রহের কথা জানান। আলোচনার অনুরোধ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে ভারত পালটা জানিয়ে দেয় অভিনন্দনকে ফেরাতে তারা কোনোরকম আলাপ আলোচনায় যাবে না। অবিলম্বে অভিনন্দনকে নিরাপদে সুস্থ অবস্থায় ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। তা না হলে পাকিস্তানকে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আসলে ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের পাইলটকে আটক করে পাকিস্তান ভারতকে লেজে খেলানোর চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রবল কূটনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ইমরান খান ২৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পাক সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১ মার্চ জুম্মাবার শুক্রবারই ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরানো হয় অভিনন্দনকে। এটাই নতুন ভারত।

এর আগেও পার্লামেন্ট ভবনে হামলা, ২৬/১১-এর হামলার মতো ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটেছে। পড়ে পড়ে মার খেতে অভ্যস্ত ভারত শত্রুর ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যাঘাতের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। এতে প্রমাণ হয় সামর্থ্য থাকলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে ভারতকে এতদিন পড়ে পড়ে মার খেতে হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের ৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির ও লঞ্চপ্যাডগুলি ছেড়ে প্রত্যাঘাতে লক্ষ্য হিসেবে সীমান্ত থেকে ৮০ কিলোমিটার ভিতরে বালাকোটকে কেন বেছে নেওয়া হলো সে ব্যাখ্যাও বায়ুসেনার তরফ থেকে এসেছে। ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর নিয়ন্ত্রণরেখার আশেপাশে লঞ্চপ্যাডগুলি থেকে জঙ্গিদের জনবহুল এলাকায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাকসেনা। আবার হামলা চালালে ভারত যাতে জঙ্গি ও আমজনতার মধ্যে তফাত করতে না পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফ্‌ফরাবাদের কাছে অবস্থিত বালাকোটে পাহাড়ের উপরে নির্জন জায়গায় গড়ে উঠেছিল লস্করের ঘাঁটিটি। এজন্যই হামলার ফলে আমজনতার প্রাণ হানি হয়নি। এই ঘাঁটিতে ৩০০ জনেরও বেশি জঙ্গিকে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিল ২৫-২৭ জন অভিজ্ঞ জইশ কমান্ডার। জইশ প্রধান মাসুদ আজাহারের ভাই মৌলানা তলহা, দাদা ইব্রাহিম আজাহার শালক ইউসুফ আজাহারের মতো শীর্ষ সন্ত্রাসবাদী নেতারাও ছিল এই ঘাঁটিতে। কয়েক মিনিটের হামলায় জইশের গোটা একটা প্রজন্মকেই কার্যত সাফ করে দেওয়া হয়েছে। অতীতে এত বড়ো সংখ্যায় জঙ্গি নিধনের দৃষ্টান্ত নেই।

এই হামলা যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় সেটাও ভারতের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ভারতের লক্ষ্য ছিল পুলওয়ামার ঘটনার দায় স্বীকার করে নেওয়া সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি। সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক হলে পাকিস্তান বা চীন কারো পক্ষেই ভারতের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করতে সমস্যা হাওয়ার কথা নয়। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এমনকি ইরান সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশও ভারতের পক্ষে রয়েছে। পুলওয়ামার প্রত্যাঘাতে শক্তি ও কূটনীতির সঠিক মিশেলে বাজিমাত করেছে ভারত। ফলে চীনেরও পক্ষেও এই মুহূর্তে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তান 'আজাদ কাশ্মীর' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। ফলে 'আজাদ কাশ্মীরে' অবস্থিত বালাকোটের প্রত্যাঘাতকে পাকিস্তান নিজের ভূমিতে আক্রমণ হিসেবে দেখাতে পারবে না। তবে কোনো অজুহাতে যদি পাকিস্তান নিজের সামরিক শক্তিতে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল হয় তা হলে তা হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কারণ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নেওয়া পদক্ষেপকে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে আক্রমণ করার অর্থ হলো সমগ্র বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে

লড়াইকে চ্যালেঞ্জ করা।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বলছে সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মুখ সমরে ভারতকে শক্তি জোগাচ্ছে একশো ত্রিশ কোটি ভারতবাসী। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি কখনোই পাকিস্তান কিংবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে পারেনি। ২৬/১১-এর মুম্বই হামলার মতো ভয়ংকর ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসের মতো শতাব্দী প্রাচীন দলও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থা নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক দখলের প্রতিযোগিতায় জিততে কংগ্রেস নেতা দ্বিগবিজয় সিংহ তো পাকিস্তানের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে এই হামলার পেছনে পাকিস্তান নয় বরং হিন্দু সংগঠনগুলির হাত আছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই প্রমাণ করার জন্য উঠে পরে লেগে ছিল। কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আয়ার তো মোদীজীকে সরানোর জন্য পাকিস্তানের সাহায্যও চেয়ে রেখেছেন। সন্দেহ নেই স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাহীন রাজনীতির জন্যই পাকিস্তান বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের মাধ্যমে বিগত সত্তর বছর ধরে ছায়া যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে।

তবে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার লেথপুরায় জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়কের উপর আত্মঘাতী হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হওয়ার পর সমস্ত দেশ জুড়ে স্বতস্ফূর্ত ভাবে মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে সমস্ত বয়সের সমস্ত পেশার মানুষ জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে মোমবাতি/মশাল মিছিল করছে। আওয়াজ ওঠছে পাকিস্তান মুর্দাবাদ, বন্দে মাতরম্, ভারতমাতা কী জয়। পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার দাবিতে ঝড় উঠছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। দেশে এখন এমনই একটি আবেগ কাজ করছে যে পাকিস্তানের পক্ষে কিংবা ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে কারো তরফে কোনোরকম অভিব্যক্তি সামনে এলেই তাকে হেনস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যারা সন্ত্রাসবাদী ইয়াকুব মেননের ফাঁসি রদ করার জন্য রাত দুটোয় সুপ্রিমকোর্ট খুলিয়েছিল, জেএনইউ যাদবপুরের আফজল গুরুর সমর্থনে মিছিল করে ভারতকে টুকরো টুকরো করার স্লোগান তুলেছিল, ভারতীয় সেনা শহিদ হলে যারা উৎসব পালন করে সেই ভারত বিরোধী গ্যাংও ওদের এজেন্ডা নিয়ে জনসমক্ষে আসতে সাহস পাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এই সমস্ত ঘটনাবলি সবই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটছে। এই উন্মাদনা দেখে হয়তো একঘরে হওয়ার ভয় থেকে স্থানীয় ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীদেরও মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমে ভারত মাতা কি জয় স্লোগান তুলে মিছিল করতে দেখা গেছে। ঘটনার পর কয়েকদিন কোনো বিরোধী দলের সর্বোচ্চ নেতাও কেন্দ্র কিংবা মোদী বিরোধী কোনো মন্তব্য করতে সাহস পাননি পাছে প্রো-পাকিস্তানি তকমা লেগে যায়। দেশ জুড়ে এই অভূতপূর্ব পরিবেশ ভারতীয় পাকিস্তানপন্থীদের এমনকী খোদ পাকিস্তানের মনে ভয়ের সঞ্চার করবে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের ২৮ শতাংশ মুসলিম ভোট নিশ্চিত করতে মমতা ব্যানার্জি পাকিস্তানের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে বিমান হামলায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে সেই প্রমাণ চাইতে লাগলেন। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে মমতা ব্যানার্জিরা এতটাই ভীত যে দেশের শত্রু ও রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে গেলেন।

কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে/কয়লা যায় না ধুলে। এই আবেগ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটে রূপান্তরিত হয়ে বিজেপির বাক্স ভরাবে না তো? চলমান পরিবেশ দেখে এই আতঙ্ক জন্মানো শুরু হলো ভারতের বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মনে। ব্যাস উবে গেল দেশপ্রেম, সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। শহিদের চিতা তখনো নেভেনি। ঘটনার দিন পাঁচেক পর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন মমতা ব্যানার্জি। না পাকিস্তান কিংবা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে নয়, আঙুল তুললেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ডিটেল এবং কেন্দ্র সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে। প্রশ্ন তুললেন ভোটের আগে যুদ্ধ জিগির কেন, ভোটের আগে এমন একটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ কেন, রুটিন গোয়েন্দা সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও কেন এড়ানো গেল না এই ঘটনা? আকাশ পথে না নিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে কেন যাওয়া হচ্ছিল জওয়ানদের ইত্যাদি ইত্যাদি? আরো অভিযোগ তুললেন আর এস এস-বিজেপির প্ররোচনাতেই দেশপ্রেমের নামে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, গভীর রাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করা হচ্ছে, ভারতমাতা কি জয় বলা হচ্ছে, দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে।

জইশ-ই-মহম্মদ ঘটনার দায় স্বীকার করে নেওয়ায় পাকিস্তানও চুপসে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ওরা যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জায়গাটাও নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি মুখ খোলার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সাংবাদিক সম্মেলন নির্বাচনের আগে ইস্যু তৈরির জন্যই এরকম ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ইমরান খানের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল উনি যেন মমতা ব্যানার্জির লিখে দেওয়া স্ক্রিপ্টই পাঠ করছেন। সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে। এখানেও পাকিস্তান বা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে একটি বাক্যও ব্যয় না করে কাশ্মীরের স্থানীয় মানুষের যুক্ত থাকার কথা বলা হলো। একধাপ এগিয়ে একটি ছবি দেখিয়ে অভিযোগ তোলা হলো পুলওয়ামার হামলার ঘটনা শোনার পরও প্রধানমন্ত্রী নাকি শুটিং করছিলেন। অথচ

পরে দেখা গেল যে ছবিটি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে সেটি সকালবেলা তোলা আর প্রধানমন্ত্রী ঘটনা শোনার পর সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে দিয়েছিলেন। এমনকী সেদিন মুখে খাবারও তোলেননি।

এদেশে ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দেশদ্রোহিতাও যে অপরাধ নয় এটা পুলওয়ামার হামলার আগে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্ত দেশে উত্তেজনার স্রোত বইলেও একসময় অসহিষ্ণুতার ধুঁয়ো তুলে যে সমস্ত বড়ো বড়ো লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবীরা পুরস্কার ত্যাগ করেছিলেন ওরা নীরব কেন? এদের মধ্যে একটি অংশ নীরব থাকলেও আরেকটি অংশ তো কাশ্মীরের ঘটনার পর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তৈরি হওয়া আবেগ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, বলছেন 'জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ভারতমাতা কী জয় স্লোগান তুলে যখন তখন মিছিল করতে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা কারা'। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বামপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘরানার 'বড়ো বড়ো' লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবীরাও বিপন্নতাবোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। সোশ্যাল মিডিয়ার আগমনের আগে পর্যন্ত মূলস্রোতের মিডিয়ার মাধ্যমে সেই ব্রাহ্মণ্য প্রথার মতো ভালোমন্দ নির্ধারণের অলিখিত দায়িত্ব এই 'বড়ো বড়ো' লোকেদের উপরেই ছিল। ফলে সে সময় আমজনতার আবেগ উচ্ছ্বাসের বড়ো বেশি একটা মূল্য ছিল না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার আগমনের পর আমজনতার আবেগের এই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত 'বড়ো বড়ো' লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামার ঘটনার পর থেকে সমস্ত দেশই ক্ষোভে ফুঁসছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে আসমুদ্রহিমাচল সবাই চাইছে এমন কিছু একটা করা চাই যাতে পাকিস্তান কোনোদিন এরকম হামলা করার সাহস না পায়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের কাছে পাকিস্তানের যুক্ত থাকার প্রমাণ চাইছেন। ভারতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছেঠে যে ২৬/১১ হামলা, পাঠান কোটের সেনা ছাউনিতে জঙ্গি হানা নিয়ে প্রচুর তথ্য প্রমাণ পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ফলে আর প্রমাণ নয় এবার চরম ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছেন সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের পক্ষে ক্রমশই সমর্থনের পাল্লা ভারি হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই জঙ্গি হামলাকে ভয়ংকর বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানকে অবিলম্বে জইশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ও জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে। শুধু আমেরিকা নয় রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন-সহ বিশ্বের বহু দেশ এই ব্যাপারে ভারতের পাশে থাকবে বলে খোলাখুলিই জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অতুলনীয় কূটনীতির জেরে সমগ্র বিশ্বের সমর্থন এখন ভারতের পক্ষে। বিশ্ব জুড়ে এমনই পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিন্দা প্রস্তাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চীনকে স্বাক্ষর করতে হয়েছে।

চীনের মতো অবস্থা কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলিরও। দেশের ভেতর চলছে পাকিস্তান বিরোধী ঝড়। এই ঝড়ের প্রতিকূলে দাঁড়ালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এই ভয় থেকে রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জি নামকাওয়াস্তে সেনার স্তুতি করলেও পরিস্থিতির নজর রাখছিল। পুলওয়ামা হামলার পর প্রত্যাঘাতের আগের দিন পর্যন্ত পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে মোদীজীকে কটাক্ষ করে ৫৬ ইঞ্চির খোঁচা দিয়ে গেলেও বালাকোটের প্রত্যাঘাতের পর রাহুল মমতা অ্যান্ড কোং কোন এক অজানা আশঙ্কায় চুপসে গিয়েছিল। উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান বন্দি হতেই পাকিস্তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ওকে ছাড়ানোর জন্য দেশের ভেতর সস্তা সেন্টিমেন্ট তৈরি করে ভারত সরকারের উপর পালটা চাপ তৈরির রাজনীতিতে নেমে পড়েন রাহুল মমতা স্পনসর্ড একদল 'মানবতাবাদী'। পাকিস্তানও এটাই চাইছিল যে অভ্যন্তরীণ চাপে ভারত আলোচনায় রাজি হলে ওদের মুখরক্ষা হবে। কিন্তু কেন্দ্র সরকারের দৃঢ়তায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিমান হামলার পর থেকে পাকিস্তান নিজের দেশে জঙ্গি শিবিরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য বলে আসছে ভারত ফাঁকা জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে, একজনেরও মৃত্যু হয়নি। নরেন্দ্র মোদীকে বিপাকে ফেলার সমস্ত পাকিস্তানি প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর মমতা ব্যানার্জি ও রাহুল গান্ধীরা মাঠে নামলেন। পশ্চিমবঙ্গের ২৮ শতাংশ মুসলিম ভোট নিশ্চিত করতে মমতা ব্যানার্জি পাকিস্তানের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে বিমান হামলায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে সেই প্রমাণ চাইতে লাগলেন। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে মমতা ব্যানার্জিরা এতটাই ভীত যে দেশের শত্রু ও রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে গিয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা সরাসরি শত্রু দেশের সুবিধে হয়। সাধারণ মানুষের মুখে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠলে আমজনতার হাতে গণধোলাই খেতে হতো।

শুধু বহির্বিশ্বে নয় পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও এমন অবস্থা যে কোনো মুহূর্তে আরো দুই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বের দরবারে বিপন্ন দেশ হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তান এখন মমতা ব্যানার্জি রাহুল গান্ধীদের বক্তব্যকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল '২৪ নিউজ' প্রাইম টাইম স্লটে লাগাতার মমতার বক্তব্য সম্প্রচার করে যাচ্ছে। মোট কথা মমতার বক্তব্যই এখন পাকিস্তানের শাসককূলের একমাত্র হাতিয়ার। একদিকে পাকিস্তানের মোল্লা মুফতিরা ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে হারানোর আবেদন রাখছে। অন্যদিকে রাহুল মমতাদের পাকপন্থী আচার-আচরণ পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে। দুর্ভাগ্য হলেও এটা সত্য যে স্বাধীনতার সাত দশক পরেও ভারতের জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন মানুষকে দেশের ১৭তম লোকসভা নির্বাচনেও পাকিস্তানের ছায়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।■

বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেল। টিভি চ্যানেলগুলিতে আছড়ে পড়ছে বিতর্ক। বারবার নির্বাচনী মুদ্দা (কেন্দ্রবিন্দু) হিসেবে উঠে আসছে চাকরি তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের তথাকথিত ব্যর্থতার প্রসঙ্গ। সমস্ত বক্তব্যের অভিমুখ একই — মোদী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। যুবক-যুবতীরা বেকার বা আধা নিযুক্ত। এখানে বুনিয়াদী প্রশ্ন আসবে আজ থেকে দু' দশক আগেও চাকরি ক্ষেত্রের যে বাজার ছিল এখন কি তা আছে? টেকনোলজি ক্ষেত্রে যে প্রয়োগ কুশলতা থাকলে এক ধরনের চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল আজ কি তা আছে? বিষয়টা তলিয়ে দেখা যেতে পারে অবশ্যই কোনো নিরেট পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি ছাড়া।

স্বাধীনোত্তর সময়ের শুরুতে দেশে উৎপাদন শিল্পের ঢেউ উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই। আনকোরা দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন জলসংসাধন, বাঁধ নির্মাণ থেকে রেল ইঞ্জিন তৈরি সবেরই ছিল বিপুল চাহিদা। খুব বেশি শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মীর বাধ্যবাধকতা ছিল না।

খনন শিল্প থেকে খনিজ তেল উত্তোলন, পরিশোধনাগার নির্মাণ থেকে এয়ার ফোর্স তৈরি এগুলি সবই ছিল অগ্রাধিকার। এই ঘনীভূত শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে ছিল সরকারি ও বেসরকারি দু' ধরনের মালিকানারই নিয়ন্ত্রণ। চার দশক এই কর্মকাণ্ডের পরিচালনার যে প্রশাসনিক কাঠামো তাতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি নিয়োজিত ছাড়া যন্ত্র বা টেকনোলজির অনুপ্রবেশ ছিল অকিঞ্চিৎকর। ভারত বিশ্ব বহির্ভূত নয়। উন্নত দেশগুলির বার্তা দ্রুত আসছিল। ৯০-এর দশকে ১০০টা বাড়ির মধ্যে হয়তো ১টি বাড়িতে টেলিফোন ছিল। তৎকালীন সংস্কার নীতির লক্ষ্য হিসেবে দুরভাষ সংযোগের ব্যাপক চাহিদা বাড়ল। তাল মিলিয়ে চলেছিল এর প্রসার। সৃষ্টি হয়েছিল হাজার হাজার চাকরির। ঠিক যেমন ৭০-এর দশকে ব্যাঙ্কের সরকারি করণের পর কাতারে কাতারে ছেলেমেয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল। কলেজ চাকরি ছেড়ে আসাও বাদ যায়নি। টেলিফোনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের পরিষেবা দ্রুতগামী করতে ডাক ও তার বিভাগ স্পিডপোস্ট চালু করল। লোক নিল। রেলের নতুন নতুন স্টেশনে কম্পিউটার ব্যবস্থায় আসন সংরক্ষণ শুরু হলো। এদিকে রাস্তায় রাস্তায় প্রকোষ্ঠ তৈরি করে পাবলিক টেলিফোন বুথ পরিচালনায় অজস্র ছেলেমেয়েরা স্বনিযুক্ত হয়ে গেল। ততদিনে নিজস্ব টেলিফোন থাকাকে সমৃদ্ধির চিহ্ন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

কলকারখানার উৎপাদন তো কম বেশি সচল রাখতেই হবে। কিন্তু একটু নজর করলেই দেখা যাবে ব্যাঙ্কের যে

কাউন্টারগুলিতে সারি দিয়ে কর্মীরা বসে থাকতেন সেগুলিতে ১০ জনের জায়গায় এখন সাকুল্যে দু'জন। অন্য বিভাগগুলিতেও কর্মীর অনুপাত একই রকম বা আরও কম। কারণ তো সহজবোধ্য, কম্পিউটার কাজ করছে। প্রতি নিয়ত তার আধুনিকীকরণের ফলে সে আরও বেশি কর্মক্ষম হয়ে উঠছে। ব্যাঙ্কে নিয়োগ তলানিতে ঠেকেছে।

সরকারি বিএসএনএল দপ্তরগুলি মাছি মারছে। বিল দিতে নগদ বা চেক নিয়ে খুব সেকেলে কিছু লোকজনই যায়। তাদের ছোটো ছোটো এক্সচেঞ্জগুলিতে ১টি কি ২টি লোক দৃশ্যমান। ৮০ ভাগ ব্যক্তিগত ফোন সমর্পিত। রাস্তায় পোস্ট বক্সের সঙ্গে অজান্তেই হারিয়ে গেছে পাবলিক বুথগুলিও। রেলের আসন সংরক্ষণ করতে স্টেশনে গেলে লোক অবাক হয়ে তাকায়। অফিসে টাইপ রাইটারের আওয়াজ কয়েক দশক আগে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দাপটে কাজ করে চলেছে কম্পিউটার কি সরকারি কি বেসরকারি ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের মহীরুহ-সম শিল্পদ্যোগগুলিকে আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজকর্মে উপযুক্ত ও আধুনিক পরিষেবা দিতে যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছিল কালক্রমে তার কার্যকারিতা হারিয়ে গেল। সকলেই জানেন একই সঙ্গে এতগুলি পরিষেবা ক্ষেত্রকে একার চেষ্টায় অকেজো করে দেওয়ার ক্ষমতাধারী সেই যন্ত্রটির (ব্যবস্থার) নাম আন্তর্জাল। ডিপার্টমেন্ট থেকে কর্মী মসৃণভাবে লোপাট হয়ে গেছে। এখন মোবাইলে শয়ে শয়ে ঘণ্টা কথা বলা যায়। নেটের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের টাকা প্রয়োজনমতো পাল্টানো যায়। চিঠি লিখে পোস্ট অফিসের কাজ বাড়াতে হয় না। মেল করলেই হলো। কোথাও গিয়ে টিকিট কাটতে লাগে না, এই অবাক যন্ত্রই সব করে দেয়। প্রসঙ্গত, পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নত অঙ্গ হিসেবে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক দূরভাষে একটি বিরক্তিকর কিন্তু fashionable চাকরির বিপুল চাহিদা বেড়েছিল। সেই মধ্যমানের লেখাপড়া করে একটু ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে পারলেই 'Back Process Outsourcing BPO' তে কাজ করে' কথাটা খুব শোনা যেত। সেই ধারাটিও প্রায় শুকিয়ে গেছে। কেন? এদের কাজ ছিল নিজেদের কাছে বিশ্বের সর্ববিধ জরুরি ব্যবহার্য বস্তু সস্তায় কোথায় মিলতে পারে তার শুলুকসন্ধান নিয়ে অপেক্ষা করা। মূলত ইয়োরোপ, আমেরিকার ধনী দেশগুলি সস্তায় কিস্তিমাত করতে এদের কাছ থেকে খবরা-খবর নিত। তাই কাজের সময় ছিল গভীর রাতে। মসলিন থেকে গামছা, রাংতা থেকে রকেট— সবেরই খবর ইন্টারনেটে 'গুগল' এখন দিয়ে যাচ্ছে। এরাও শহিদ হওয়ার পথে। পাইকারি হারে চাকরির অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, ডাক ও তার, টেলিফোন, রেল প্রভৃতিতে নিযুক্ত হতে পারলেই আদর্শ নিশ্চিন্ততার যে ছবি সমাজগ্রাহ্য ছিল, তা আর কোনওদিন সেই হারে ফিরে আসবে না। কেননা প্রযুক্তি এগিয়েই চলবে। কালকের প্রযুক্তি আজ তামাদি। বিকল্প পথ তো সন্ধান করতেই হবে। সরকার তাই যে 'মুদ্রা যোজনা' এনেছে তা নির্দিষ্টভাবে স্বনিযুক্তি বা স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার রাস্তা। এক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র কৃষির উৎপাদনের প্রক্রিয়াকরণ। যথাযথ সংরক্ষণ। পিঁয়াজ, টমেটো, আলু রাস্তায় গড়াগড়ি খাওয়ার আগে যদি সময়মতো কিছু সংরক্ষণ প্রযুক্তি আওতাধীন এমন ছেলেমেয়েদের হাতে যায়, এ থেকে সোনা ফলতে পারে। ভুললে চলবে না, এখনও দেশ কৃষিপ্রধান। শহরে কাজের হদিশ না পেরে তাকে গ্রামেই ফিরতে হবে। চলতি প্রজন্ম সরাসরি চাষ করতে ইচ্ছুক নয়। হ্যাঁ, উচ্চ প্রশাসনিক পদে চাকরি আছে, আদালতে বিচারকের বিপুল সংখ্যায় চাকরি আছে (সরকারের কোষাগারে খামতি, তাই নিয়োগে অক্ষম), নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকরি আছে, পর্যটন শিল্পে চাকরি আছে। এগুলি পছন্দসই বা নিজে উপযুক্ত না হলে কৃষির হাত ধরা ছাড়া পথ নেই। আজ সরকারকে বারবার কৃষকদের দুর্গতির দায়ে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। সরকারের গৃহীত নীতির মধ্যে এই সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সর্বাধিক গুরুত্বের। কেননা এর মধ্যে রপ্তানিরও প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সরকার দেশব্যাপী স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সুযোগ রয়েছে উদ্যোগপতি হওয়ার। পেট্রল গাড়ি ছেড়ে ইলেকট্রিক ভেহিক্যালস্ এসে গেছে। তাল মেলাতে সরকার বদ্ধপরিকর।

এই পাঁচ বছরে তথাকথিত সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির মরা গাঙে জোয়ারের অলীক চেষ্টা না করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে বীমা, নির্দিষ্ট মাসিক কিস্তির বিনিময়ে আকর্ষণীয় পেনসন, স্বাস্থ্যবীমার মতো (দান দেওয়া প্রকল্প নয়) দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে নাগরিক জীবনে যে গুণগত পরিবর্তনগুলি মানুষ ease of doing business -এর মতো অনুভব করতে পারবেন এবং সেই মতো নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন সেগুলি (১) তুমুল হল্লা করার পেট্রলের দাম ২০১৪ - ৭১.৫৬; ২০১৬ - ৭২.২৪ (২) রপ্তানি বিলিয়ন ডলারে ২০১৪ - ২৬৪; ২০১৯ (এপর্যন্ত) ২৭০ (৩) উপভোক্তার আস্থার সূচক ছিল ১১৭ এখন ১২৯ (৪) রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৬.৭১ আছে ৫.৮০ (৫) দেশবাসীর আকাশ ভ্রমণ ছিল ৬-৭ কোটি, আছে ১৩.৯ কোটি (৬) মোবাইল ডাটার দাম ১জিবি ৩৩ টাকা, এখন ১১ টাকা (৭) বাড়িতে শৌচালয় ছিল ৩৮ শতাংশ, এখন ৯৮ শতাংশ (৯) আলুর দাম ছিল ২৫ টাকা, পেঁয়াজ ২৩ টাকা, এখন ১৫ ও ২০ টাকা।

কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক, কি বৈদেশিক, কি জাতীয় নিরাপত্তা (দেশ ও বিদেশ তোলপাড় করা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও তা নিয়ে দেশদ্রোহীদের গণহুল্লোড় সবাই চাক্ষুষ করেছেন) সর্বক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্থিতধী ও পরক্রমী নেতৃত্বের পর্যাপ্ত নমুনা রেখেছেন। জানিয়েছেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। মানুষ তা বিশ্বাস করেছে। শুধু উদ্বাহু হয়ে চাকরি নেই, চাকরি নেই বলে গলা না ফাটিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে হবে।

সারা বিশ্ব মধ্যমানের চাকরি সঙ্কটে আক্রান্ত। কেননা দিনকাল প্রযুক্তির অধীন। বিশ্ব আন্তর্জালে আবদ্ধ। আসছে কৃত্রিম বৌদ্ধিকতা (artificial intelligence)। ▌

ভারতীয় পরিবার প্রথাকে মূল্যবোধকেন্দ্রিক করে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে : আর এস এস

গত ৮ থেকে ১০ মার্চ গোয়ালিয়রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক হয়ে গেল। এই বৈঠকে সরকার্যবাহ শ্রী সুরেশজী (ভাইয়াজী) যোশী প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে, সারা দেশে এখন ৩৭০১১ স্থানে ৫৯২৬৬ শাখা, ১৭২২৯ স্থানে সাপ্তাহিক মিলন এবং ৮৩২৮ স্থানে সঙ্ঘমণ্ডলী চলছে। প্রতি বছরের মতো বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির পক্ষে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এবছরও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এবারে আমাদের দেশের পরিবার ব্যবস্থা ও পরম্পরাকে কেন্দ্র করে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই দুইটি প্রস্তাব পুরোপুরি এখানে প্রকাশ করা হলো :

মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আমাদের সমাজের মহার্ঘ্য অবদান ভারতীয় পরিবার প্রথা। মূলত এর স্বাতন্ত্র্য হিন্দু পরিবারের কার্যকারিতাকে ব্যক্তি থেকে জাতি ('নেশন' অর্থে ব্যবহৃত)-র দিকে অভিযাত্রায় সেতুবন্ধনীর কাজ করে, যা কালক্রমে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর গন্তব্যে পৌঁছে যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একদিকে যেমন সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে, অন্যদিকে তেমন নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংস্কার বদ্ধমূল করে দিতে এবং মূল্যবোধের জন্ম দিতেও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বহুমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিন্দু সমাজই হলো তার শাশ্বত অস্তিত্বের মুখ্য কারণ এবং এই পরিবার-প্রথা এর অন্যতম কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

আমাদের পরিবার প্রথা যা ভারতবর্ষের পুণ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একদা মূর্ত করেছিল, বর্তমান সময়ে তা কিছুটা অসংহত অবস্থায় রয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী মানসিকতার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের পরিবার প্রথার ভাঙনের মুখ্য কারণ। ভোগবাদী চিন্তাসর্বস্বতা আত্মকেন্দ্রিকতা, উগ্রস্বভাব, অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা, সীমাহীন লোভ, মানসিক চাপ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাকার নানাবিধ সমস্যার বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান সময়ে আমাদের যৌথ পরিবার এক দম্পতি পরিবার (নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি)-এ পরিণত হয়েছে। খুব অল্প বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের ছাত্রাবাসে রাখবার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার অক্ষমতায় আজকের প্রজন্মের মধ্যে একাকীত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে মাদক সেবন, হিংসা, নৃশংস অপরাধ এবং আত্মহত্যার ঘটনা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বৃদ্ধাবাসের ক্রমশ সংখ্যাবৃদ্ধি, পরিস্থিতিকে উদ্বেগবহ করে তুলেছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা এমতাবস্থায় তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে যে আমাদের পরিবার প্রথাকে সচল ও তার মূল্যবোধভিত্তিক চরিত্রকে বজায় রাখতে হলে প্রয়োজনীয় ও প্রভূত প্রয়াস নিতে হবে। নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও আচরণের মধ্যে দিয়ে এটা নিশ্চিত করা দরকার যে আমাদের পরিবার-জীবন-চরিত্রগঠন, জীবনবোধ পুরিপুষ্টিতে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সুদৃঢ়করণে বিশেষ কার্যকরী। পরিবার-জীবন অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হয়ে ওঠে পরিবারের সকলের একসঙ্গে বসে আহারে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায়, উৎসব উদযাপনে একসঙ্গে তীর্থভ্রমণে, মাতৃভাষার ব্যবহারে এবং স্বদেশীর তাগিদে পরিবার ও সামাজিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও উৎকর্ষতায়। পরিবার ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ গড়ে তোলা, সামাজিক, ধর্মীয় কিংবা শিক্ষার ব্যাপারে ও গরিবকে সাধ্যমতো সাহায্যের ক্ষেত্রে অবদানের স্বাক্ষর রাখাই আমাদের পরিবারের চরিত্র হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের পরিবার প্রথায় মা হলেন মেরুদণ্ড। মাতৃশক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মনে গেঁথে দেওয়া প্রয়োজন। সম্মিলিত ভাবে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের পরিবারের নীতি হওয়া দরকার। পারিবারিক আলোচনায় অধিকার ফলানোর চেয়ে কর্তব্যের বিষয়টিরই অধিকতর প্রাধান্য পাওয়া দরকার। কারোর নিজের কর্তব্য পালন না করাই অন্যের অধিকার সুরক্ষিত করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিচ্যুতি ও গোঁড়ামি আমাদের সমাজে থাবা বসিয়েছে। পণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, বিভেদ, অনাবশ্যক আড়ম্বর ও বেহিসেবি খরচ, কুসংস্কার ইত্যাদি আমাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র সমাজের কাছে তাই অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা আহ্বান জানাচ্ছে, এই দুষ্কৃত ও অনভিপ্রেত বিষয়গুলিকে নির্মূল করার জন্য

সর্বতোভাবে প্রয়াসী হতে এবং মূল্যবোধ-ভিত্তিক ও সম্প্রীতিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হতে, যার সূচনাটুকু হতে পারে আমাদের নিজেদের পরিবার থেকেই।

পূজ্য সাধু-সন্তগণ এবং সামাজিক, ধর্মীয়, শৈক্ষিক ও বৌদ্ধিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আমাদের সামাজিক উন্নতিতে। প্রতিনিধি সভা তাঁদের কাছেও অনুরোধ জানাচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করতে তাঁরাও যেন সদর্থক ভূমিকা নেন। সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন মঞ্চও সমাজে মূল্যবোধ জাগরণের ক্ষেত্রে কার্যকরী যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রতিনিধি সভা সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে তাঁরা যেন চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমাদের পরিবার প্রথার শিকড়টিকে আরও শক্তিশালী করবার এবং নতুন প্রজন্মকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সামনে এনে দাঁড় করাবার বার্তা দিতে সক্ষম হন। প্রতিনিধি সভা একইসঙ্গে সমস্ত সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে তাঁরাও যেন পরিবার প্রথাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সদর্থকভবেই অনুভব করেন, যাতে করে শিক্ষানীতি ও পরিবারভিত্তিক আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হতে পারেন।

পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় যাঁরা একক দম্পতি পরিবারে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের কর্তব্য মূল পরিবারের সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রাখা এবং সময়-সুযোগ অনুযায়ী কিছুদিন বাদে বাদে মূল পরিবারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সময় কাটিয়ে আসা। পরিবারের প্রাচীন উৎপত্তিস্থানের সঙ্গে সংযোগ আসলে শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগই অব্যাহত রাখে। পারিবারিক মিলনোৎসবের আয়োজন কিংবা পরিবারের কোনও কর্ম-প্রকল্পের দায়িত্বও তাঁদের পালন করা উচিত। শিশুদের আবশ্যিক শিক্ষাও যত্নসহকারে পারিবারিক পরিবেশ ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যেই হওয়া উচিত। বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উৎসব আয়োজন এবং আমাদের বসবাসের এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান বৃহত্তর পরিবারের ধারণাটি মানবমনে গেঁথে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দরকারি। কিশোর ও যুবকদের ভারসাম্যযুক্ত উন্নতিতে 'বাল-গোকুলম বা 'সংস্কারবর্গ'-এর মতো কার্যসূচির উদ্যোগ নেওয়া বিশেষ জরুরি।

ত্যাগ, সংযম, ভালোবাসা, স্নেহ, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য ভিত্তিক জীবনই হল সুখী পরিবারের মূল ভিত্তি-প্রস্তর। পরিবারে এই সমস্ত গুণের সমাহার একটি সুখী জীবনের যাবতীয় উপাদানের জন্ম দেয়। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা স্বয়ংসেবক-সহ সমগ্র সমাজের কাছে, বিশেষ করে আধুনিক প্রজন্মের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে যে আমাদের পরিবার প্রথাকে আরও প্রাণবন্ত, স্পন্দিত ও মূল্যবোধ-কেন্দ্রিক করে তুলতে তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা না করেন।

প্রস্তাব-২

হিন্দু সমাজের পরম্পরা ও বিশ্বাসের সুরক্ষা প্রয়োজন

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হিন্দু বিশ্বাস ও পরম্পরাকে অপমান ও আঘাত করার পরিকল্পিত নকশা তৈরি হয়েছে কায়েমি স্বার্থের ভিত্তিতে অ-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতকে প্রতিষ্ঠার তাগিদে।

হিন্দুত্ব কোনও একশলাকা যন্ত্র নয় বা একচেটিয়া অধিকার সম্পন্ন ধর্ম নয়। কিন্তু বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশের বিবিধ পন্থার মধ্যে জীবনের দর্শন খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম, বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি, স্থানীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা, লোক-সংস্কৃতি উৎসব ইত্যাদি স্বতন্ত্রতার মধ্য দিয়ে যার নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এটা অত্যন্ত বিসদৃশ হবে যদি আমাদের সনাতন পরম্পরার বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যের ওপর গতানুগতিক সমান ব্যবস্থাকে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়।

হিন্দু সমাজ সবসময়ই তার রীতি-নীতির প্রয়োজনীয় ও সময়েচিত সংস্কারকে স্বাগত জানায়। কিন্তু এই ধরনের প্রয়াস নেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং জনসচেতনতার শিকড়কেই মুখ্যত প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এটি কেবলমাত্র আইন প্রক্রিয়া নয়, স্থানিক পরম্পরা ও গ্রহণযোগ্যতা সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমগ্র হিন্দু সমাজ আজ এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কেরলের ক্ষমতসীন বামপন্থী সরকার মাননীয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট)-এর সাংবিধানিক বেঞ্চের পবিত্র শবরীমালা মন্দিরে সমস্ত বয়সের মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে রায়ের প্রয়োগের অজুহাতে হিন্দু সমাজের আবেগকে কোনও গুরুত্ব দেয় নাই।

শবরীমালা হলো ভক্ত ও ভগবানের স্বতন্ত্র সম্পর্কের একটি বিশেষ নমুনা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাতে তাঁরা বিবেচনায় রাখেননি বহুবছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত ও সমাজের দ্বারা স্বীকৃত একটি পরম্পরার প্রকৃতি ও তার পেছনের যুক্তিটিকে। এই ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রধান বিষয়গুলিকেও বিবেচনায় রাখা হয়নি। মহিলা ভক্তদের আবেগও এখানে ধর্তব্যের মধ্যে আসেনি। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিবেচনায় না থাকার ফলে স্বতন্ত্র, বৈচিত্র্যময় একটি পরম্পরা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল তার সমূহ ক্ষতি হয়েছে।

সিপিএমের নেতৃত্বধীন কেরল সরকারের কার্যকলাপ আয়াপ্পা ভক্তদের আবেগকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভক্তদের বিশ্বাস ও আবেগকে আঘাত করার জন্য রাজ্য সরকার পেছনের দরজা দিয়ে নাস্তিক, অতি-বাম মহিলা কর্মীদের মন্দিরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছে। এইভাবে সস্তা রাজনৈতিক ফয়দা লাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে আদর্শগত যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করারও চেষ্টা করেছে সিপিএম। এই কারণেই ভক্তেরা, বিশেষ করে মহিলা ভক্তরা নজিরবিহীন ভাবে লাগাতার আন্দোলনের পথে গিয়েছেন তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সমস্ত ভক্তদের সম্মিলিত সংবেদনশীলতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা পোষণ করছে এবং তাঁদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে মন্দির-ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে তাঁরা যেন নিয়ন্ত্রিত ও সংযত আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। প্রতিনিধি সভা কেরল সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে ভক্তদের বিশ্বাস, আস্থা, আবেগ ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে যেন তাঁরা যথোপযুক্ত মর্যাদা দেন এবং তাঁদের নিজের জনগণের ওপরই হিংসার আশ্রয় না নেন। প্রতিনিধি সভা আশা রাখে যে মহামান্য আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ও অন্যান্য আবেদনও সংবেদনশীলতার সঙ্গে খতিয়ে দেখবেন। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে তাঁরা যেন উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে 'শবরীমালা আন্দোলনকে রক্ষা করো' কর্মপ্রক্রিয়াটিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেন। ■

কৃষি প্রণালীর প্রযুক্তি প্রয়োগে সুন্দরবনের জনজাতি চাষিদের জীবন জীবিকা ও উন্নতি

সৌমিক বিশ্বাস, ড. মানবেন্দ্র রায়

সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি প্রশস্ত বনভূমি। এই অরণ্য প্রাকৃতিক বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র এই তিন নদীর অববাহিকার বদ্বীপ এলকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি। পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা যথাক্রমে— উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে এই সুন্দরবন বনভূমি বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড়ো ম্যনগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন পরিচিত— যা বিশ্বের সর্ববৃৎ অখণ্ড বনভূমি। ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের প্রায় ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার অংশ রয়েছে বাংলাদেশে এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতে। সমগ্র সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতোধারা,কাদাচর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততা-সহ ছোটোছোটো দ্বীপমালা। মোট বনভূমির ৩১.১ শতাংশ, অর্থাৎ ১, ৮৭৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে হয়েছে নদীনালা, খাঁড়ি, বিল মিলিয়ে জলাজায়গা। সুন্দরবন স্বনামে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি, চিত্রাহরিণ, কুমির ও সাপ-সহ অসংখ্য প্রজতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। সুন্দরবনই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জায়গা যেখানে ৪০০ প্রজাতিরও বেশি পাখি রয়েছে। বাংলায় সুন্দরবন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সুন্দর যে বন অর্থাৎ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর বনভূমি। সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে, যা সেখানে প্রচুর জন্মায়। এখানে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি যার মধ্যে ৫৪টিতে মানুষ বসবাস করে। এখানে ১৯টি ব্লক আছে এবং মানুষের দ্বারা তৈরি নদীবাঁধ সমুদ্রের লবণাক্ত জলের প্রবেশ আটকে জনবসতি গড়ে তুলতে সহায্য করেছে। বেশিরভাগ দ্বীপগুলিতে ইলেকট্রিসিটি না থাকার কারণে সন্ধ্যে হলেই অন্ধকার ঢলে পরে।

উপকূলবর্তী এলাকার খালের সঙ্গে নদীর যোগাযোগ আছে। প্রতি বর্ষায় এখানকার বেশির ভাগ জমি জলে ডুবে থাকে। এরই পাশাপাশি ওই খালের মাধ্যমে বা নদীবাঁধ ভেঙে নদীর জোয়ারের নোনা জল জমিতে ঢুকে যায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬০০-১৮০০ মিলিমিটারের মতো। বায়ুর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সারাবছরই বেশি থাকে এবং এই আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক হয় বর্ষা কালে। এখানকার মাটি শুষ্ক অবস্থায় খুবই শক্ত ও

সারণি								
বিভিন্ন ফসল ও প্রাণী উৎপাদনের উপর কৃষি প্রণালী প্রযুক্তির প্রভাব								
ফসল/প্রাণী	প্রকল্প শুরুর আগে		প্রকল্প শুরুর পরে					
	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		১০১৫-১৬	
	এলাকা	ফলন	এলাকা	ফলন	এলাকা	ফলন	এলাকা	ফলন
ধান (খরিজ)	২৪.৪১	৪৩৯৩৮	২৪.৪১	৭৬৩৮২	২৮	১২৬৫৬০	৬৬	২৯৭৪৫০
ধান (বোরো)	১.০২	৩৫০০	২.৬৭	১৩৯৫৮	২.৩৬	৭৯০৮০	১.৭	৮৭৩০
আলু	০.৭৮	৬০১০	১.৮২	৩২৭৬০	১.৬২	৩৫০৯২	১.৭	৩৭৪৩৪
লঙ্কা	০.৫৮	৪৫০	২.৫	৪০৫০	৩.২	৫৬৪৮	৪.২৫	৬৮৯০
খেসারি	১.০০	৫৪৫	২.০	১৫৭৮	৪.০০	৪০৭৬	৫.৩	৫৮২৫
সবজি	১.২২	৫৫৬৮	২.০১	১৫২৬৬	২.০২	১৫৩৫২	৩.২	১৪৫২০
সূর্যমুখী	—	—	০.১৬	১২৭	১.০৯	১১৭১	১	২০৭০
পেঁয়াজ	—	—	১.৩৩	১২০০০	১.৫৪	১৬৯৪০	১.৬৫	১৮৫৬২
গো-পালন	৮৪	৮৯০৪	৮৪	১০৮১০	১১৩	১৩৮৯৯	১১৪	১৩৭৯৪
মুরগি-পালন	১৯২	৯৬০০	৫০০	৪২৫০০	৪২৫	৫৩১২৫	১২১৫	৮৫৭১৪
হাঁস-পালন	৬০	৩৩০০	১৫০	১১২৫০	১৬০	১৪৪০০	১৮২	১৭২৯০

ভিজে অবস্থায় গলে যাওয়ায় জলনিকাশের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। মাটির অম্লতা ৭.৫ থেকে ৮.৫-এর মধ্যে। এখানকার বেশির ভাগ মাটি লবণাক্ত, ক্ষারযুক্ত গাঙ্গেয় পলি মাটি দ্বারা গঠিত। এলাকার ভারী কাদামাটিতে মুক্ত ম্যাগনেশিয়ম বেশি থাকায় মাটির ভাব চটচটে। লবণাক্ত ও ক্ষারীয় ধর্মের ক্লোরাইড ও সালফেট আয়নের আধিপত্য বেশি এই ধরনের মাটিতে। সমুদ্রের নোনা জলের জন্য উপকূলবর্তী এলাকায় এই মাটি বেশি দেখা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলের এই রকম মাটিকে সমস্যাসঙ্কুল মাটিও বলে। মাটিতে লবণের পরিমাণ বর্ষা-পরবর্তী সময় থেকে মে মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং আবার বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়।

২০০৯ সালে বিধ্বংসী আয়লার দাপটে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবন অঞ্চল। ৫০ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমির ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। আয়লার তাণ্ডবে নোনাজল ঢুকে পড়ে, ফলস্বরূপ বিঘার পর বিঘা চাষযোগ্য জমি পতিত জমিতে পরিণত হয়। এই কারণে কৃষকদের রুটিরুজিতে টান পড়ে। জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ওই জমিতে সেভাবে চাষাবাদ হয় না।

আয়লা পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের অর্থনৈতিক, পরিকাঠামোগত ও কৃষিপ্রযুক্তিগত সমস্যা ছাড়াও, চাষিদের মনোবল ফেরানো সব থেকে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, জীবন জীবিকা নিশ্চিন্তকরণের জন্য কৃষিপ্রণালী অনুসন্ধান সংস্থা, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১১৬ জন জনজাতি কৃষককে নিয়ে কাজ শুরু করে। পূর্বে ১২-১৩ সালে ওই এলাকার চাষিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন ফসল যেমন— ধান, মুগ, খেসারি, ডাল জাতীয় শস্য ইত্যাদির সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা অবলম্বনে চাষাবাদ করা হয়। অন্যান্য ফসল যেমন— আলু, লঙ্কা, টমেটো, ওল, আদা প্রভৃতি সবজি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যাবস্থা করা হয়। কিছু কিছু চাষি গো-পালন করে, কাজেই দুধের উৎপদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মিনারেল মিশ্রণ এবং টিকাকরণের ব্যাবস্থা করা হয়। চাষিদের দিয়ে পুকুর খনন করানো হয় এবং মাছ চাষে অনুপ্রাণিত করা হয়। এর পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক বিকাশের উন্নতি সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কৃষকদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ানোর জন্যও অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের কৃষিকাজ এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্যও গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক কর্মসূচি। চাষযোগ্য জমি সংখ্যার বৃদ্ধি করার ব্যবস্থাও চলছে। সাধারণ মানুষ পশুপালনের দিকেও মনোযোগ যাতে দেয়, সেইদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানুষের রুজি রোজগার এবং অর্থ উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ব্যাবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনায় তিন বছরের গবেষণার ফলে চাষিদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রতিফলন তাদের বিভিন্ন ফসলের চাষের এলাকা বৃদ্ধি, পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। সঙ্গে ব্যাপকহারে বিভিন্ন ফসল যেমন— খারিজ ধান, বোরো ধান, আলু, লঙ্কা, খেসারি, সবজি, সূর্যমুখী, পেঁয়াজ ইত্যাদির ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি দ্রষ্টব্য)। ▌

চিঠিপত্র

নীতিহীন সাংবাদিকতা

রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে সঠিক নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করা তাদের নীতির মধ্যে পড়ে। কিন্তু সম্প্রতি রাফাল নিয়ে বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলির সীমাহীন মিথ্যা প্রচার দেখে সত্যই বিচলিত হতে হয়। সংবাদপত্রে তাদের হেডলাইন— প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে কাছ থেকে নাকি রাফাল তথ্য চুরি গেছে! তথাকথিত প্রথম শ্রেণীর এক বাংলা সংবাদপত্র হেডলাইন করেছে— ‘চৌকিদারের ঘরেই চুরি’ কতটা মিথ্যা! প্রকৃত সত্য জানতে পারলাম এক ইংরেজি সংবাদপত্রে। কেন্দ্র সুপ্রিমকোর্টকে জানিয়েছে— চুরি যাওয়া তথ্যের উপর বিচার করা যায় না, এ মামলা শেষ করা উচিত। চুরি বা লোপাট হয়ে যাওয়া তথ্যের সত্যতা কেন্দ্র জানাবে না।

আসলে বাংলা সংবাদপত্রগুলি যে তথ্য চুরি বলে লিখছে সেটা তথ্য লোপাট করে বা মনগড়া তথ্য লিখে এক সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে মামলা করা হয়। সেই তথ্যের কোনো অরিজিন্যাল কপি নেই। তাই এমন লোপাট করা মিথ্যা তথ্যের উপর মামলা হতে পারে না।

এখন সংবাদমাধ্যম তাদের নীতি থেকে বিচ্যুত। যেন তেন প্রকারে অর্থাগমই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সচেতন পাঠকদের উচিত সংবাদের সত্যতা যাচাই করা। সংবাদপত্রের হেড লাইন আজ আর প্রকৃত সংবাদ নয়।

—**শুভজিৎ দাশ,**
২৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৬।

বাজারি পত্রপত্রিকা আইসিস জঙ্গিদের পৈশাচিকতার বিষয়ে নীরব

মাত্র ১৫ বছর বয়সে লন্ডনের বেথনাল গ্রিন হাইস্কুলের ছাত্রী সামিমা বেগম বর্বর ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের সঙ্গে যোগদান করে গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসী হিসেবে খ্যাত হওয়ার তাড়নায় পালিয়ে গিয়েছিল সিরিয়াতে। বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে তার উজ্জ্বল মুখের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন তার বয়স ১৯ এবং আই এস জঙ্গির ডেরা থেকে পালিয়ে সে আবার ব্রিটেনে ফিরে যেতে চাইলেও ব্রিটেন সরকার তাকে নিতে অস্বীকার করছে। ব্রিটেন-সহ ইউরোপের প্রায় সব দেশ বর্বর আই সিস, আলকায়দার তাণ্ডবলীলা আজও প্রত্যক্ষ করে চলেছে। পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবার হত্যালীলার সাক্ষী ভারতের জনতা। কিন্তু হিজাব পরিহিতা সামিমার উজ্জ্বল মুখ আনন্দবাজার-সহ বিশ্বের তাবড় গণমাধ্যমে ভেসে বেড়াবার একটি মাত্র কারণ হলো সামিমার তৃতীয় সন্তানটিও খাদ্য, জল, ওষুধ এবং ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। টাইমস্ পত্রিকার সাংবাদিকেরা জানাচ্ছেন এর আগেও জঙ্গিদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সামিমা সিরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত শরণার্থী শিবিরে বছর তিনেক কাটায়। এবং সেখানেও সে ২টি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল যারা সূর্যের আলো বেশিদিন দেখেনি। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে ৩টি সন্তানের জন্ম এবং সেটাও আবার শরণার্থী শিবিরে এবং সবশেষে তৃতীয় সন্তানটিকে নিয়ে শরণার্থী শিবির থেকে পালানোর চেষ্টা একটা মৌলিক প্রশ্নকে তুলে ধরে— এই বয়সেই যদি এতগুলো সন্তানের মা তাকে হতে হয় তাহলে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তারা কি মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করতে চলেছে? গোটা বিষয়টির মধ্যে এক ভয়ানক পৈশাচিকতা লুকিয়ে আছে। জঙ্গি হিসেবে এ কে-৪৭ বা ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে বিধর্মীদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবার তাগিদেই সামিমা-সহ এরকম বহু ‘নাসিমা’ বা ‘পারভীন’রা ইউরোপ ছেড়ে সিরিয়া এবং ইরাকে ঘাঁটি গেড়েছিল। রক্তস্রোতে স্নান করতেই এই মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত সজ্জিতাদের আগ্রহ সীমাহীন। অথচ এই রক্তের হোলি খেলার মধ্যেই তাদের সন্তান সম্ভবা হওয়ায় কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়নি। আনন্দবাজার পত্রিকা সামিমার মুখচ্ছবি প্রকাশ করতে পেরে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছে কিন্তু সিরিয়ার শরণার্থী শিবিরের পৈশাচিকতা নিয়ে তারা নীরব থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করছে।

—**শুভ্র সান্যাল,**
ইংরেজবাজার, মালদহ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সালটা ১৯৯২। আমি তখন ঘাটাল নগর প্রচারক। রামজন্মভূমি আন্দোলন জোরকদমে চলছে। প্রান্ত সঙ্ঘচালক কালিদাস বসু মেদিনীপুর শহরে সরস্বতী শিশু মন্দিরে কার্যকর্তাদের বৈঠক নিচ্ছিলেন। সেখানে কয়েকজন কার্যকর্তা হিন্দিভাষী ছিলেন। কালিদা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সবাই বাংলা বোঝেন তো?’ কয়েকজন কার্যকর্তা হাত তুলে বললেন, ‘আমাদের একটু অসুবিধা হয়। কালিদা আবার তাদের প্রশ্ন করলেন, ‘কত বছর বাংলায় রয়েছেন?’ কেউ ১৫ বছর, ২০ বছর উত্তর দিল। কালিদা আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘এতো বছর রয়েছেন তবুও বাংলা শেখেননি?’ একজন বললেন, ‘বাংলাভাষা তো আমাদের মাতৃভাষা নয়, তাই শিখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে।’ তখন কালিদা বললেন, ‘ইংরেজি, উর্দু, আরবি কয়েকটি বিদেশি ভাষা ছাড়া সব ভাষাই আমাদের মাতৃভাষা। হিন্দি, ভোজপুরী, ওড়িয়া, অসমিয়া, মারাঠী-সহ সব আঞ্চলিক ভাষাই আমাদের মাতৃভাষা— কোনো ভাষাই বিদেশি ভাষা নয়। বাংলা ভাষা আমাদের সবার মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাগুলি যে আমাদেরই মাতৃভাষা তা কালিদার কাছ থেকে সেদিন জানতে পারলাম।

—**সঞ্জয় মুখার্জী,**
হাওড়া, কেশবনগর।

রমজান মাসে মুসলমানরা কোনো কাজ বন্ধ রাখেন না

ভারতের নির্বাচন কমিশন সপ্তদশ লোকসভার নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে। এবারের নির্বাচনের সময় মুসলমানদের রমজান মাস পড়েছে। আর তাতেই মেকি মুসলমান দরদি নেতা ও ধর্মগুরুরা বেজায় চটেছেন। এসময় তারা রোজা রাখে। ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি তারা না খেয়ে থাকেন। সেই কষ্টে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁর আদরের ববি হাকিম দিয়ে বলিয়েছেন যে, তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে সম্মান করেন, কিন্তু কমিশনের মুসলমানদের কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল। এখন কথা হচ্ছে, রমজান মাসে মুসলমান ভাইয়েরা কি কোনো কাজকর্ম করেন না? তাঁরা তো অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট সবই করেন। গ্রামে-গঞ্জে মুসলমান শ্রমিকরা শারীরিক পরিশ্রমের সব কাজই করেন। তাঁরা একটু সময়ের জন্য ভোট দিতে যেতে পারবেন না? এটা আসলে মুসলমানদের নিয়ে ভোটের রাজনীতি। হায়দরাবাদের এমপি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ঠিক কথা বলেছেন, রোজা রেখে মুসলমানরা সব কাজ করতে পারলে ভোটও দিতে পারবেন। রোজার সময় তারা বেশি করে ভোট দিতে যাবেন। মুসলমানদেরও বুঝা উচিত যে, তাদের নিয়ে নেতা-নেত্রীরা রাজনীতির খেলা খেলে চলেছে।

সুবল কর্মকার
গোলাপগঞ্জ, মালদা

জীবনের সর্বত্র ধর্মের প্রভাব থাকা সমীচীন

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ১১ মার্চ বরুণ দাসের 'জীবনের মতোই সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব থাকাটা কি সমীচীন?' প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে মনে হয়েছে জীবন, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে লেখক খুবই অভিজ্ঞ। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করেননি। শেষ স্তবকে তিনি লিখেছেন, 'সুতরাং যতদিন না ধর্মের প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে' কিন্তু 'প্রকৃত অর্থ' প্রবন্ধের কোথাও স্পষ্ট হলো না। মনে হলো লেখক ধর্ম ও রিলিজিয়নের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। তাই ইসলামকেও তিনি ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন। আসলে ইসলাম হলো একটি 'মজহব'। খ্রিস্টান হলো রিলিজিয়ন। ভারতের বৌদ্ধ, জৈন হলো একটি মত বা পন্থ। ধর্ম হলো তাই যা শুভ চিন্তা এবং সৎ বুদ্ধি ও কর্মকে ধারণ করে রাখে। তাই জীবনের সর্বত্র ধর্মের প্রভাব থাকা সমীচীন। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে পারস্পারিক হানাহানি বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য।

শ্যামল মিশ্র
হরিশচন্দ্রপুর, মালদা

রাষ্ট্র সংস্কৃতিবাচক শব্দ

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ১১ মার্চের ৪৩ পৃষ্ঠায় স্বপন কুমার নাগ মহাশয়ের 'জাতীয় সংহতির মূল কথা ভুমির সঙ্গে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক' বিশেষ নিবন্ধটির জন্য লেখক ও স্বস্তিকা পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানাই। ইদানীং বহু বিদগ্ধ লেখক দেশ ও রাষ্ট্রের কোনো পার্থক্য করেন না। রাষ্ট্র শুধু ভূমিখণ্ড নয়, ঋষি অরবিন্দের কথায় ''এ তো পৃথিবীর শুধুমাত্র একখণ্ড ভূমি নয়, কিছু ভাষাগত প্রকাশের ক্ষেত্র নয়, মনগড়া কল্পনা নয় – এ হচ্ছে শক্তি। এই শক্তি দেশের লক্ষ-কোটি মনুষ্য সম্পদ, তারা মিলে মিশেই গড়ে ওঠে জাতি– ভবানী মহিষমর্দিনী যেমন শক্তির সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ শক্তি। তিরিশ কোটি ভারতবাসী মানুষের ঐক্য-বিধায়িনী এই শক্তিই তো জাতি -- তাকেই আমরা ভবানী-ভারতী বলে জানি।''

এই জাতি বা রাষ্ট্র রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক-বাচক শব্দ নয়, এ সংস্কৃতিবাচক। অথর্ববেদ ঘোষণা করছে– আত্মজ্ঞানী ঋষিরা কঠোর সাধনা করেছেন বলেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রতেজ উৎপন্ন হয়েছে। অথর্ববেদের আর একটি ঘোষণা – 'মাতাভূমি পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যাঃ' অর্থাৎ এই ভূমি আমার মা, আমি তাঁর পুত্র। এই ভাবনাই রাষ্ট্রবোধ সৃষ্টি করেছে। এরকম আরও সমৃদ্ধ রচনার জন্য লেখকের প্রতি আবেদন রইল

সৌরভ সিংহ
রামপুর, বাঁকুড়া

প্রত্যাঘাত

হনাদার বৈরীরা হেনেছে আঘাত
ভারত সীমান্ত পারে,
প্রাণপ্রিয় মোদের মাতৃভূমির
সার্বভৌমত্ব সংহারে।
অতন্দ্র সৈনিক আমাদের চিত্তে
সদা জাগরুক দেশভক্তি,
বীরের রক্তই ধমনীতে বহিছে
বাহুতে অদম্য শক্তি।
হাতিয়ার নিয়ে ছিলাম আমরাও
প্রস্তুত লাখো সন্তান,
বিনাশিয়া শত্রু অটুট ৰেখেছি
স্বাধীনতা, স্বদেশের মান।
মাভৈঃ মন্ত্রে নিয়েছি যে দীক্ষা
হেনেছি তাই প্রত্যাঘাত,
আঘাতের পরিণাম কত বিয়োগান্ত
শত্রুরা বুঝেছে নির্ঘাত।

ধীরেন দেবনাথ
কল্যাণী, নদীয়া

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

সি আর পি এফ কমান্ডার ঊষা কিরণ

সুতপা বসাক ভড়

বস্তারের কুখ্যাত নকশাল প্রভাবিত এলাকাতে নিযুক্ত একজন সি আর পি এফ কমান্ডার একের পর এক নকশাল অপারেশান পরিচালনা করে চলেছে এবং প্রত্যেকটিতে সফল হয়েছে। এই যুব কমান্ডার আজ সি আর পি এফ-এর গর্ব। দেশের প্রতি সমর্পিত এই কমান্ডার নিজ কার্যক্ষেত্র হিসাবে বস্তারকেই বেছে নিয়েছিলেন। নিজ পছন্দের কার্যক্ষেত্রে নকশালদের সমূলে বিনষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশেষ করে মহিলাদের কল্যাণার্থে সমর্পিত কোবরা-২০৪ ব্যাটালিয়ানের এই দুঃসাহসী কমান্ডার হলেন একজন মহিলা, নাম— ঊষা কিরণ।

ঊষা কিরণ ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে বস্তারের দরভা ডিভিশনে অবস্থিত সিআরপিএফ ক্যাম্পে নিযুক্ত আছেন। এই নিযুক্তি তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছেন। ঘন জঙ্গল, দুর্গম পথ এবং পাহাড়ে ঘেরা বস্তার সংভাগ-এর দরভা হলো সেই জায়গা, যেখানে ২০১২ সালে কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতাদের নকশালরা হত্যা করেছিল। এই এলাকায় কোনো নারীর পক্ষে হাতে বন্দুক নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাটেলিয়ানকে পরিচালনা করা সামান্য কথা নয়। বস্তারে নিয়োজিত কোবরা ২০৪ ব্যাটেলিয়ান এক বছরের মধ্যে পামেড়, কোট্টাগুড়া এবং বাসাগুড়াতে নকশালদের সঙ্গে সামনা-সামনি ভয়ংকর মোকাবিলা করে। এতে নকশালদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। পামেড়-এর রামাপল্লীতে নকশালদের ক্যাম্প ধ্বংস করে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে এই ব্যাটেলিয়ান।

সিআরপিএফ কমান্ডার ঊষা কিরণ বস্তারের নকশালদের কাছে ভয়ংকররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সব থেকে বেশি নকশাল

প্রভাবিত সুকমা জেলায় নিযুক্ত কোবরা-২০৪ ব্যাটেলিয়ানের এই কমান্ডারের সাহস ও বীর্য প্রশংসীয়। নকশালদের বিরুদ্ধে তিনি সংহাররূপিণী হয়ে বারংবার আবির্ভূত হয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হয়ে চলেছেন। চতুর, সাহসী এবং দেশের প্রতি সমর্পিত এই যুবামাতৃশক্তি আজ পর্যন্ত প্রতিটি অপারেশনে সফল।

ঊষা কিরণকে 'ভোগ' ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে ইয়ং অ্যাচিভার অব দ্য ইয়ার (২০১৮) হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই পুরস্কার দেশের জওয়ানদের মনোবল বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বস্তারের বনবাসীদের জীবনে আসা সুখময় পরিবর্তনকে সম্মান জানিয়েছে। এই পুরস্কার বীরাঙ্গনা ঊষা কিরণ দেশের ওইসব প্রহরীদের প্রতি সমর্পণ করেছেন যাঁরা ভারতের শান্তি বজায় রাখার জন্য দেশসেবায় আত্মসমর্পণ করেছেন। ঊষার এই মনোভাবকে সম্মান জানিয়েছে সিআরপিএফ (সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স)। এডিজি কুলদীপ সিংহের মতে ভালো কাজের জন্য এই ধরনের পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পূর্ণ ফোর্সের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা নকশাল প্রভাবিত জঙ্গলে নকশালদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নতিকল্পেও কাজ করছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁদের জওয়ানদের কাজ যখন পরিচিতি লাভ করে পুরস্কৃত হয়, তখন তাঁরা আরও উৎসাহ নিয়ে দেশসেবা করেন।

গুরুগ্রাম, হরিয়ানা নিবাসী ঊষাকিরণ সিআরপিএফ-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পরে বস্তারে কাজ করাকেই গুরুত্ব দেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে খ্যাতিপ্রাপ্তা ঊষা এক বছরের মধ্যে প্রায় একডজন নকশাল অপারেশন পরিচালনা করেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। ঊষা ট্রিপল জাম্পে স্বর্ণপদক পাওয়া একজন অ্যাথলিট। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর পরিবার তিন পুরুষ ধরে দেশ সেবার মতো মহান কাজে জুড়ে আছেন। তাঁর দাদু এবং বাবা ছিলেন সিআরপিএফ-এ। বর্তমানে ঊষার স্বামী ঈবী কিরণ সিআরপিএফ-এর চিকিৎসক এবং তিনিও বস্তারে নিযুক্ত।

ঊষা কিরণের কাহিনি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এইরকম একজন দেশের প্রতি সমর্পিত ব্যক্তিত্বের জন্য আজ দেশবাসী গর্বিত। একটু পেছন ফিরে তাকালে আমরা দেখব, ঊষার পরিবারের ভূমিকা— দাদু, বাবার পরে ঊষা। এখানে নেই কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব; নেই নারী-পুরুষের বিভেদ। অযৌক্তিক তুলনা নেই কোথাও। সেজন্যই আমরা আজ নতুন যুগের ঊষা কিরণকে পেয়েছি। আমরা গর্বিত তাঁর জন্য। শুধু কি এটুকুই? আমাদের পরিবারে কি আমরা আরও ঊষাকে সুযোগ করে দিতে পারি না? একজন ঊষা নিজেকে সার্থক প্রমাণ করে আমাদের মধ্যে যে উদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়েছে, তাই দিয়ে আসুন আমরা আগামীদিনের আরও অনেক ঊষা কিরণের পথ প্রশস্ত করে নিজেদের ধন্য করি।

তেজপাতা বহু রোগে মহোপকারী

অসিত বরণ আইচ

● অদ্ভুত ব্যাপার, আজকাল তেজপাতার ব্যবহার ক্রমশ কম হচ্ছে। কেন? খুব সস্তা বলে? নাকি অজ্ঞতার কারণে?

● তেজপাতা কাঁচা ও শুকনো দু'রকমই ব্যবহার করা যায়। তেজপাতা সেদ্ধ জল বহু রোগে মহোপকারী।

● তেজপাতা সেদ্ধ জল সর্দি-কাশিতে খুবই উপকারী। চায়ের মতো চুমুক দিয়ে দিনে ২-৩ বার পান করতে হবে।

● তেজপাতা সেদ্ধ জল ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ করে ও কিডনির পাথর দূর করে।

● তেজপাতা ১০/১২ ঘণ্টা গরম জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর ছেঁকে সেই জল ২/৩ বার খেলে লাল প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

● তেজপাতা ভেজানো জল পেটের জ্বালা ভাব দূর করে।

● তেজপাতা বাটা গায়ে মেখে আধঘণ্টা পরে স্নান করে নিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। এতে ঘামাচিও মরে।

● তেজপাতা সেদ্ধ জল দিয়ে চুল ধুলে চুলপড়া বন্ধ হয় এবং খুসকিও মরে।

● তেজপাতা সেদ্ধ করে সেই জলের ভাপ নিলে মুখের বলিরেখা দূর হয়, মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।

● শরীরের ব্যথা কমাতে ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমাতে তেজপাতার ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত।

● তেজপাতা সেদ্ধ জল ঠাণ্ডা করে কুলকুচি করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

● ঘন ঘন জল তেষ্টা পাওয়া একটা রোগ। জল দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না। গোটা পাঁচেক তেজপাতা তিন গেলাস জলে ফুটিয়ে দেড় গেলাস অবস্থায় নামিয়ে ছেঁকে দিনে ২-৩ বার পান করতে হবে। সেরে যাবে।

● সর্দিতে গলার স্বর বুজে এলে তেজপাতা সেদ্ধ জলে গার্গল করলে খুব কাজ হবে।

● তেজপাতা বাটা ব্যথায়, দাঁতের গোড়ায় এবং গরম করে ফোঁড়ার উপরে লাগালে উপকার হয়।

● তেজপাতা সেদ্ধ জল খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

● দুধের দুর্গন্ধ দূর করতে দু-একটি তেজপাতা দুধে ফুটিয়ে নিন।

● গরম মশলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তেজপাতা। সুজি বা পায়েসের তেজপাতা চাটবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত ছোটোবেলায়। এক হাজার টাকা কিলো না হওয়া পর্যন্ত মনে হয় হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে তেজপাতা।

● যজ্ঞে আহুতি দিন তেজপাতা। বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যে ধুনোতে তেজপাতা চূর্ণ বা টুকরো দিন। পরিবেশ শুদ্ধ ও সুগন্ধিত হবে।

● রক্তের তেজ বাড়ায় বলেই এর নাম তেজপাতা।

● দাদে ও নতুন শ্বেতিতে তেজপাতা সেদ্ধ জলে তুলো ভিজিয়ে লাগাতে হবে ও সেদ্ধ জল খেতেও হবে।

যা কিছু তৃণমূলের বিপক্ষে তাই বিজেপির পক্ষে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ৪২ টার মধ্যে ৪২ টাই দখলে রাখতে হবে। ঠিক উল্টোদিকে অমিত শাহ বলেছেন, ২২টা আসন এবার এখানে জিতে নিতেই হবে। ফলত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের তাড়িত করছে তা হলো— গতবারের যে কটা লোকসভা আসন জিতেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সে কটা কি ধরে রাখতে পারবেন এবার, নাকি বাংলায় এবার সত্যিই গৈরিকীকরণ হবে? শুধু দিল্লি দখলের প্রশ্নে নয়, পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের লোকসভা নির্বাচন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনটি কার্যত একটি সেমিফাইনাল। এই নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে যাবে, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন কোন খাতে বইবে। জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করলে, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার মতো পূর্ব ভারতের এই দুই রাজ্যকে এবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই দুই রাজ্যেই চমকপ্রদ ফল করে বিজেপির সর্বভারতীয় ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করার কৌশলী চিন্তাই বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ করেছেন। যদি কোথাও কোনো ঘাটতি থেকে যায়, তাহলে সেই ঘাটতি এই দুই রাজ্য মিটিয়ে দিতে পারবে— এমন ভাবনাও বিজেপি সভাপতির রয়েছে। তবে, বালাকোটে ভারতীয় বিমান বাহিনী জঙ্গি শিবির ধ্বংস করে দিয়ে আসার পর, সমগ্র দেশেই যেরকম জাতীয়তাবাদী আবেগের স্ফুরণ দেখা দিয়েছে এবং জাতীয় রাজনীতিতেও দ্রুত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির ঘাটতি কিছু থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং, এটাই মনে হচ্ছে যে, ২০১৪-র আসন সংখ্যাকেও যদি এবার বিজেপি ছাপিয়ে যায়, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। এবং যে জাতীয়তাবাদী আবেগের স্ফুরণ ঘটেছে, তাতে বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপির চমকপ্রদ ফল হবে— এমনও আশা করা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সব থেকে বড়ো সুবিধা এখানে তাদের হারানোর কিছুই নেই। বরং জয় করার জন্য রয়েছে অনেকখানি জমি। এখানে যদি বিজেপি লড়াই করে দশটা আসনও দখল করতে পারে, তবে সেটাই হবে তাদের লাভ। তাতে ভর করেই তারা ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তড়িদ্ গতিতে এগোতে পারবে। আর যদি অমিত শাহের নির্ধারিত করে দেওয়া ২২টি আসনের লক্ষ্যকে ছুঁতে পারে বিজেপি— তবে বলতেই হবে তাদের বঙ্গ দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস। এই রাজ্যের ৩৪টি লোকসভা আসন তাদের দখলে। বলা যায়, নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্যের শীর্ষবিন্দুটিকে তারা ইতিমধ্যে ছুঁয়ে ফেলেছে। এখন আর তাদের নতুন করে জেতার কিছু নেই। বরং, যা আছে তাকে ধরে রাখার লড়াই তৃণমূলের। যদি একটি আসনও তৃণমূলের কমে যায়, তাহলে তার জনপ্রিয়তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। আর যদি একাধিক আসন কমে, তাহলে বলতেই হচ্ছে, ২০২১ অশনি সংকেত বয়ে নিয়ে আসবে তৃণমূলের জন্য।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপি অন্যান্যবারের তুলনায় আরও কয়েকটি বিষয়ে বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এর আগে বিজেপির ভিতরে যে আন্দোলন বিমুখতা পরিলক্ষিত হতো, আরও ভালোভাবে বললে, আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিজেপির যে ঘাটতি দেখা যেত, দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর সে ঘাটতি অনেকটাই মিটেছে। সভাপতি হওয়ার

২০০৯-এর লোকসভা এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুযোগটি পেয়েছিলেন এবার সেটি বিজেপি পাচ্ছে। বিজেপি এটাকে কতটা কাজে লাগাতে পারবে— তার ওপর নির্ভর করছে কতটা নির্বাচনী সাফল্য সে পাবে।

পর সবকটি জেলায় দিলীপবাবু অনবরত সফর করেছেন, করছেন। জনসভা এবং কর্মী সভায় নিয়মিত ভাষণ দিয়ে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করেছেন। ফলে জেলায় জেলায় বিজেপি কর্মীরা আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, আন্দোলনমুখী হয়েছে। যে কারণেই বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে তারা। কর্মীদের এই আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠাটা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে অনেকটাই সুফল দেবে। পাশাপাশি, নির্বাচনী কৌশলে পটু সেরকম কোনো নেতা এতদিন সে অর্থে বিজেপিতে ছিলেন না। মকুল রায় যোগ দেওয়ার পর সে ঘাটতিও বিজেপির অনেকটাই মিটেছে। লোকসভা নির্বাচনে মুকুল রায়কে প্রার্থী ঠিক করার গুরুদায়িত্ব দিয়ে অমিত শাহ কৌশলী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিছু কিছু জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের ঘর যেমন ভেঙে দিয়েছেন মুকুল রায়, তেমনই আরও একটি কাজ সুকৌশলে তিনি করে ফেলেছেন। তা হলো, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে একটি অবিশ্বাস এবং সন্দেহের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া। তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে বলেছেন, 'কারা কারা অন্য দলে যোগ দেওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছেন— তা আমি জানি।' এতেই প্রমাণ হয়ে যায়, নিজের দলের নেতাদের স্বয়ং নেত্রীই বিশ্বাস করতে পারছেন না। দলের মধ্যে এই অবিশ্বাস এবং সন্দেহের বিষ, আখেরে লোকসভা নির্বাচনে ক্ষতিই করবে তৃণমূলের।

এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের যা যা মাইনাস পয়েন্ট, সেগুলিই এক অর্থে বিজেপির প্লাস পয়েন্ট। একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে মূল লড়াইটা হবে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপি। কংগ্রেস এবং সিপিএম এই প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে। প্রায় শূন্য থেকে গত কয়েক বছরে ভিতরই এভাবে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়া এটা বিজেপির বড়ো রাজনৈতিক সাফল্য। গত লোকসভা নির্বাচনেও এই রাজ্যে বিজেপি কটা আসন পাবে— তা নিয়ে জনতার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। এবার কিন্তু জল্পনা হচ্ছে— বিজেপি কি টেক্কা দিতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। এটাই প্রমাণ করছে, কংগ্রেস কিংবা সিপিএম নয়, তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে মানুষ ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে বিজেপিকে। এটাও মানতে হবে, ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, মাত্র আট বছরের ভিতরে ২০১৯ সালে তার সেই জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে পৌঁছছে। তাঁর জনপ্রিয়তা যে এত দ্রুত হ্রাস পাবে— তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীও আঁচ করতে পারেননি। ২০১১-র নির্বাচনে কোনো সাম্প্রদায়িক তাস খেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসেননি। সিপিএমের উৎখাতের ডাক তিনি দিয়েছিলেন। সিপিএমের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলী। ক্ষমতায় আসার পর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নগ্নভাবে অন্যায় এবং অন্যায্য মুসলমান তোষণের রাজনীতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীকে ক্ষুব্ধ করেছে। এই মাত্রাতিরিক্ত তোষণের রাজনীতিই এবার লোকসভা নির্বাচনে বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে তৃণমূলের পক্ষে। এরই পাশাপাশি লাগামছাড়া তোলাবাজি, মস্তানি, আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রসঙ্গটি তো রয়েছেই। এগুলিও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে মানুষকে। এই রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মতো পাপকর্মটিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এবং সরকার করেছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল। তদুপরি বিরোধী দলের কর্মীদের মিথ্যা মামলায় হেনস্থা করা, বিরোধী দলের সভা সমাবেশে অনুমতি না দেওয়া এসবও রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ করেছে। এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দলের ভাবমূর্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তি লোকসভা নির্বাচনে বিপদের কারণ হতে পারে। সর্বোপরি যেটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা হলো, ওর স্বঘোষিত সততার প্রতীক ইমেজে কালির ছিঁটে লেগেছে। সারদা, নারদা, রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির পর আর কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলকে সততার সার্টিফিকেট দিতে রাজি নয়।

বিজেপির সুবিধা এই যে, এই রাজ্যে বিজেপি কখনো ক্ষমতায় ছিল না। ফলে কোনোরকম কলঙ্ক বা ক্ষোভ তাকে সেভাবে স্পর্শ করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন ক্ষোভ সামলাতে হবে, বিজেপি তখন সেই ক্ষোভকেই নির্বাচনে কাজে লাগাতে পারবে। ২০০৯-এর লোকসভা এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুযোগটিই পেয়েছিলেন। এবার সেটি বিজেপি যাচ্ছে। বিজেপি এটাকে কতটা কাজে লাগাতে পারবে— তার ওপর নির্ভর করছে কতটা নির্বাচনী সাফল্য সে পাবে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে অন্য রাজনৈতিক দলের ঘর ভাঙিয়ে বিজেপি বেশ কিছু নেতানেত্রীকে তাদের দিকে এনেছে। এদের ভিতর কেউ কেউ দলীয় প্রতীকে বিজেপির প্রার্থীও হবে এবারের নির্বাচনে। এ নিয়ে বিজেপি মহলে কারো কারো ক্ষোভ রয়েছে। যাদের ক্ষোভ রয়েছে তারা নির্বাচনী পাটিগণিতটা বুঝছেন না। স্বয়ং অমিত শাহ সর্বভারতীয় স্তরে বৈঠকে দলীয় কর্মীদের বলেছেন, এবারের নির্বাচনে আসন বাড়াতেই হবে। এ রাজ্যে আসন বাড়াতে গেলে বিরোধী দল ভাঙিয়ে এনে আসন বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। কারণ, সে অর্থে এ রাজ্য সর্বত্র বিজেপির তেমন শক্তিশালী সংগঠনও নেই। তদুপরি, বিজেপির পরীক্ষিত যে সব নেতৃত্ব রয়েছেন, তাদের ভিতর নির্বাচনী যুদ্ধে জিতে আসার মতো তেমন নেতাও বিরল। সবদিক বিবেচনা করেই দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের নির্দেশেই অন্য রাজনৈতিক দলগুলি থেকে নেতানেত্রীদের বিজেপির দিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসার একটি প্রচেষ্টা চলছে।

একটা প্রশ্ন ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে উঠতে শুরু করেছে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্য থেকে এবার কতগুলি আসন পাবে? কতগুলি আসন পাবে— তা ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই অবৈজ্ঞানিক। তবে, এটুকু বলাই যায়, শাসক বিরোধী একটি হাওয়া এ রাজ্যে উঠেছে, তাতে বিজেপির পক্ষে অভাবনীয় ফলের প্রত্যাশা করাই উচিত। ফলাফল যে তাঁর খুব একটা অনুকূলে যাচ্ছে না তা বোধকরি তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোও আঁচ করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন— '২২-২৩টা আসন এখানে জোর করে দখলের চেষ্টা চলছে।' বোঝাই যায়, এগুলি হচ্ছে তার আগাম অজুহাত। ২২-২৩টা আসন যে আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়, সেটা তিনিই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ৩৪টা আসন যে এবার কমবেই— সে ইঙ্গিত তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমোর কথাতেই মিলেছে।

কিন্তু বিজেপির পক্ষেও অস্বস্তির কিছু কাঁটা আছে। আর সে কাঁটা আছে বিজেপির অভ্যন্তরেই। বিজেপি সংগঠনের ভিতরে থেকেই কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রত্যহ প্রকাশ্যে নানা মন্তব্য করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলার কাজটি করে চলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কটূক্তি করে নিজেদের অন্তর্কলহটিকে প্রকাশ করে ফেলেছেন। এরা বুঝছেন না, ব্যক্তিবিশেষের বিরোধিতা করতে গিয়ে সমগ্র সংগঠনটিরই ক্ষতি করছেন এরা। নির্বাচনের আগে দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারাটা দেখানো যখন সর্বাধিক জরুরি, তখন এসব করে কার স্বার্থ রক্ষা করছেন এরা?

পঞ্চান্ন বছরের থেকে এগিয়ে থাকবে পঞ্চান্ন মাস

চন্দ্রভানু ঘোষাল

সে এক দেশ ছিল বটে আমাদের। যখন ভারতবর্ষ বলতে বোঝাত অগুণতি ছোটো ছোটো শহর আর লক্ষ লক্ষ গ্রাম। ছোটো শহরে যারা থাকতেন, নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তাদের বেশিরভাগেরই কোনও ধারণা ছিল না। আর গ্রাম? দারিদ্র্যের চাপে নুয়ে পড়া সেইসব গ্রামে মানুষ থাকতে বাধ্য হতেন, কারণ থাকা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় ছিল না।

সম্প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ এবং মিডিয়া সেই ঝাপসা হয়ে যাওয়া ভারতের স্মৃতি উসকে দিয়েছে। তাদের আহ্লাদের কারণ গুজরাটে প্রিয়াঙ্কা বঢরার সভায় ভিড়। অনেকদিন ধরেই মিডিয়া একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে প্রিয়াঙ্কার রাজনীতিতে আসার অর্থ হলো, আর কংগ্রেসকে রোখা যাবে না। তিনি আসবেন, দেখবেন এবং জয় করবেন। মিডিয়া এবং কংগ্রেসের এই বস্তাপচা বিশ্বাসের পিছনে রয়েছে সেই পুরনো ভারতবর্ষের ছবি। যখন আমজনতার কাছে গান্ধী পরিবারের সদস্যরা ছিলেন রাজবংশের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাদের ইংরেজি ঘেঁষা হিন্দি উচ্চারণ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, দেবদুর্লভ চেহারা এবং দামি পোশাক-আশাক দেখে প্রশ্নাতীত আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করতেন ভারতীয়রা। কিন্তু এই ভারত সেই ভারত নয়। ১৯৯১ সালের পর যারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাদের মধ্যে পি.ভি. নরসিমহা রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদী ঔপনিবেশিক ভারতের প্রতিনিধি নন। তারা সনাতন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। আমজনতার প্রতিনিধি। সুতরাং মিডিয়া এবং কংগ্রেস যতই গেলানোর চেষ্টা করুক, ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল প্রিয়াঙ্কার পক্ষে তা আদপেই সম্ভব নয়।

সভায় প্রিয়াঙ্কা তিনটি প্রশ্ন তুলেছেন। চাকরি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কৃষক সমস্যা নিয়ে। যদিও কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে এইসব ক্ষেত্রে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে তাই নিয়ে তিনি বিশেষ মুখ খোলেননি। তবুও তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমে চাকরি। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, নতুন চাকরি সৃষ্টিতে মোদী সরকার ব্যর্থ। দেশে এত বেকার নাকি আগে কখনও ছিল না। কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য তারা যদি মনে রাখেন তাহলে ভালো করবেন। আগেকার প্রতিটি সরকার যে পরিমাণ জাতীয় সড়ক নির্মাণ করেছে তার থেকে ২.২৫ গুণ বেশি নির্মাণ করেছে মোদী সরকার। রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পাওয়ার গ্রিড বাড়ানো হয়েছে ২ লক্ষ কিলোমিটার। ৮ কোটি শৌচালয় তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আড়াই কোটি বাড়ি তৈরি হয়েছে। অনেকগুলি সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। মুদ্রা ঋণ যোজনায় ঋণ পেয়েছেন ১৩ কোটি বেকার ছেলেমেয়ে। প্রশ্ন হলো, এই বিপুল কর্মকাণ্ড কি কর্মসংস্থান করেনি? বাড়তি লোক না নিয়ে কি এই দুরূহ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো যায়? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর, যায় না। কিছুদিন আগে শিল্প সমীক্ষক সংস্থা সিআইআই ভারতের ২৮টি রাজ্যের ৩৫০টি শিল্পক্ষেত্রে সমীক্ষা করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে গত চার বছরে ১৪.৯ কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে প্রতি বছর গড় বৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ। এই

বৃদ্ধির কারণ সরকারের দুটি সিদ্ধান্ত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ২ শতাংশ সুদ হ্রাস এবং ট্রেড রিসিভেবল-ই-ডিসকাউন্টিং ব্যবস্থার (টি আর ই ডি এস) প্রবর্তন। প্রিয়াঙ্কা বঢরা সম্ভবত এইসব তথ্য সম্বন্ধে খুব একটা খোঁজখবর রাখেন না। নরেন্দ্র মোদী প্রায়ই বলেন, কংগ্রেসের পঞ্চান্ন বছরের শাসনের পাশে তাঁর পঞ্চান্ন মাস অনেকাংশেই উজ্জ্বল। কথাটির সারবত্তা বোঝা যাবে প্রিয়াঙ্কা বঢরার দ্বিতীয় অভিযোগটির সত্যতা বিশ্লেষণ করলে। অভিযোগটি নারীর ক্ষমতায়নের। প্রিয়াঙ্কার মতে ভারতে মেয়েরা নিরাপদ নন। তাদের ক্ষমতায়নের জন্যেও এই সরকার কিছু করেনি।

বস্তুত, রাজনৈতিক মতবিনিময় নামক প্রাজ্ঞজনের কাজটিকে রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা যে-শিশুসুলভ দোয়ালায় নামিয়ে এনেছেন, তা দেখে সম্ভবত ঘোড়াও হাসবে। ভাই-বোনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মোদী সরকারের আমলেই তিন তালাক বিল পাশ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন-প্রয়াসের এর থেকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ভারতবর্ষের মুসলমান মহিলারা বহু বছর ধরে সামন্ততান্ত্রিক বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথার শিকার। মুসলমান পুরুষেরা পারসোনাল ল'য়ের ছত্রছায়ায় থেকে ফোনে, ফেসবুকে— এমনকী কাগজের টুকরোয় তিনবার তালাক লিখে বিয়ে ভেঙে দিতেন। মুহূর্তের মধ্যে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতেন মুসলমান মহিলারা। এদের মধ্যে অনেকেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হতেন। আত্মহত্যাও করেছেন অনেকে। প্রিয়াঙ্কা কি বলতে চান, তিন তালাকের শিকার এইসব মহিলারা নারী নন? তাদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজন নেই?

অবশ্য প্রিয়াঙ্কা যদি এরকম বলেন বা ভাবেন, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। চার দশক আগে তিন তালাকের শিকার এক হতভাগিনীর ঘরে ফেরার আরজির মধ্যে প্রিয়াঙ্কার বাবা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কোথাও কোনও মানবিকতা খুঁজে পাননি। এবং শেষ পর্যন্ত, ইসলামিক কট্টরতা ও পুরুষতন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার করে ভোট হারাবার ভয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। মহিলাদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা সেদিন কংগ্রেস করেছিল, নরেন্দ্র মোদী তারই প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতার ধারাবাহিকতা অবশ্য কংগ্রেস বজায় রেখেছে। নরেন্দ্র মোদীর প্রয়াস যাদের বাধায় পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারেনি তাদের শীর্ষে রয়েছে কংগ্রেস। কারণ সেই একই। বিল সমর্থন করলে মুসলমানরা ভোট দেবে না। সুতরাং ক্ষমতায় থাকার জন্য, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকার জন্য যদি মুসলমান মহিলাদের সর্বনাশ হয় তো হোক।

প্রিয়াঙ্কা এইরকম এক বংশের সন্তান। এইরকম এক দলের নেতা। তাঁর তৃতীয় অভিযোগ কৃষকদের নিয়ে। মোদী সরকার কৃষিঋণ মকুব করেনি। অর্থাৎ কিছু করেওনি। মোদী সরকারের কৃষিনীতির ধরনটা বোঝার চেষ্টা করলে প্রিয়াঙ্কা নিজেই তাঁর অভিযোগের অসারতার প্রমাণ পেতেন।

ঋণ মকুবের মতো নগদ বিদায়ের রাজনীতি করলে কৃষকের সাময়িক উপকার হয়। শাসক দলেরও রাজনৈতিক মুনাফা হয় কিন্তু কৃষকের দীর্ঘমেয়াদি কোনও উপকার হয় না। মোদী সরকারের লক্ষ্য কৃষকের দীর্ঘমেয়াদি উপকার। তাছাড়া, যত অমানবিকই হোক, এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের ঋণ মকুব করা যায় কি? সরকারের টাকা মানে করদাতাদের টাকা। দেশের টাকা। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সেই টাকা রাজনৈতিক মুনাফার জন্য নয়ছয় করলে রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয়, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং জিনিসপত্রের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায়। ইউপিএ আমলে এই ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে আবারও ঘটবে। গুজরাটের সভায় প্রিয়াঙ্কা জোর গলায় বলেছেন হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্য— মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানে ক্ষমতায় ফিরেই কংগ্রেস কৃষিঋণ মকুব করেছে। ভালো কথা। কিন্তু কাদের ঋণ মকুব করেছে কংগ্রেস? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে যারা ঋণ নিয়েছেন কিংবা মহাজনের কাছ থেকে— তাদের ঋণ মকুব করতে পেরেছে কি কংগ্রেস? ক্ষুদ্র চাষিদের কতটা উপকার হয়েছে? আর, কী উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কর্পোরেট ফার্মিং সংস্থার ঋণ মকুব করে দিল? বলা বাহুল্য, এসব প্রশ্নের উত্তর প্রিয়াঙ্কা দেননি।

এবার দেখা যাক কৃষকদের জন্য মোদী সরকার ঠিক কী করেছে। সারাদেশে ৫০০টি ই-মন্ডি তৈরি হয়েছে। যেখানে কৃষকেরা ফড়ে এবং আড়কাঠিদের সাহায্য ছাড়াই সরাসরি ক্রেতাদের ফসল বিক্রি করতে পারছেন। ফসলের দামে অন্য কেউ ভাগ না বসানোর ফলে কৃষকেরা অনেক বেশি লাভ করছেন। ফসলের সহায়ক মূল্য দেড় গুণ বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র। কৃষককে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ইউরিয়া, সয়েল হেলথ কার্ড এবং বন্যা ও খরায় সরকারি সাহায্য। সারা দেশে জলসেচ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। এমনকী যেসব প্রকল্পের কাজ ৩৫ বছর আগে শুরু করেও শেষ করা যায়নি, মোদী সরকারের আমলে সেই কাজ শেষ হয়েছে রকেটের গতিতে। অন্নদাতা প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে প্রত্যেক কৃষককে বছরে ৬,০০০ টাকা করে বিশেষ ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র। মাত্র চার মাসে পনেরো লক্ষ কৃষকের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তা পৌঁছেও গেছে। ইউপিএ আমলে কৃষিখাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা। মোদী সরকারের জমানায় ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা। সুতরাং প্রিয়াঙ্কা যদি ভালো করে জেনে বুঝে তারপর অভিযোগ করেন সেটা তার পক্ষে ভালো হবে। অন্যথায় তিনি রাহুল গান্ধীর বোন হিসেবেই জনমানসে চিহ্নিত হবেন। নিজেই প্রমাণ করবেন ইন্দিরা গান্ধীকে নকল করলেই ইন্দিরা গান্ধী হওয়া যায় না।

কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধীদের আরেকটি অভিযোগ, মোদী সরকারের জমানায় দেশ নাকি মারাত্মক অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক-পরবর্তী ভারতে জাতীয়তাবোধের যে লহর বইছে সেটা নাকি ঠিক নয়। নেহরুর জাতীয়তাবাদই শ্রেষ্ঠ। কীরকম সেই জাতীয়তাবাদ? আনন্দবাজার পত্রিকায় এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অমিতাভ গুপ্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ পরম্পরা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস ছিল না নেহরুর। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের প্রতিটি কোণ উন্নয়নের স্পর্শ পেলেই এক সূত্রে বাঁধা পড়বে দেশ। সেটাই জাতীয়তা। এমন একটি আজগুবি ধারণা নেহরুর মতো মানুষের পক্ষেই ভাবা সম্ভব। কারণ তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শিক্ষাসচিব মেকলের কারখানায় তৈরি ভারতীয়। মেকলে চাইতেন, ভারতীয়রা শুধু জন্মসূত্রে ভারতীয় হোক। কিন্তু স্বভাবে, চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসে হোক ব্রিটিশ। নেহরু ছিলেন তাই। নিজেকে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় ভাবতে ভালোবাসতেন। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর শিরোপা তাকে কোনওদিন প্রত্যাশিত আনন্দ দেয়নি। সুতরাং তাঁর জাতীয়তাবাদ যে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ হবে এবং সেখানে যে ধর্ম ও পরম্পরার কোনও জায়গা থাকবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মভাবনার দেশ। ধর্ম এখানে যন্ত্র নয়, জীবন্ত সংস্কৃতি। আপামরের সংস্কৃতি। জীবনযাপনের পথ। ধর্ম বাদ দিয়ে ভারতীয়ত্বের ভাবনা অসম্পূর্ণ। বিরোধীরা যাকে অসহিষ্ণুতা ভাবছেন সেটা আসলে প্রতিরোধ। ঔপনিবেশিকতা যাতে আর মাথা তুলতে না পারে তারই জন্য এই প্রতিরোধ। ভারতবর্ষ স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ। ভারতের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে ২০১৪ সালে। বস্তুত, এই ভাবনারই প্রতিফলন আমরা দেখি নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে। তিনি বলতে পারেন, 'ছেড়োগে তো হাম ছোড়েঙ্গে নহী।' যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমাদের মারলে আমরাও মারব। ছাড়ব না।' গত পাঁচ বছরে তিনি শুধু মানুষের প্রত্যাশা পূরণই করেননি, প্রতিটি ভারতীয়ের স্বকীয়তারও নির্মাণ করেছেন। 'অচ্ছে দিন' নিয়ে তরজায় মত্ত বিরোধীরা কথাটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল।

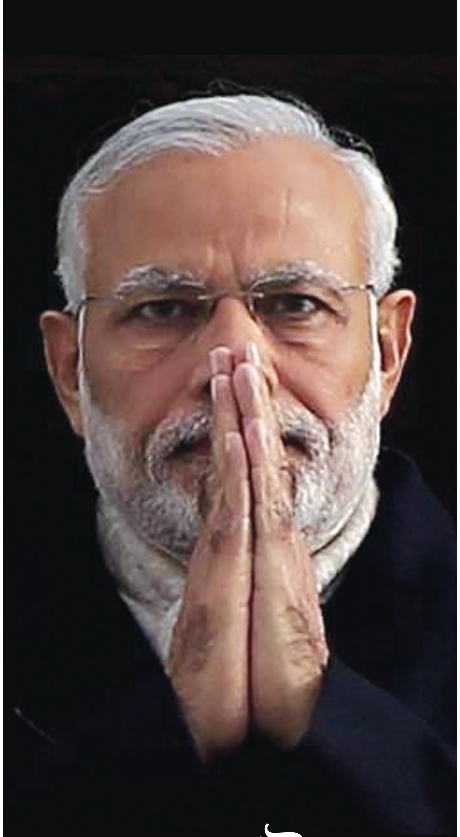

লড়াই একটি মুখের সঙ্গে হাজার মুখোশের

সনাতন রায়

হেরে যাওয়ার ভয়ে ভীত মানুষকে লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা প্রায়শই বলতেন— তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তো ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই জিতে বসে আছ। কারণ তোমাকে মাতৃজঠরে প্রবেশ করতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শুক্রাণুর সঙ্গে লড়াই করে।

ঠিক এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল যখন ভোটবাজারে বিরোধীদের রণহুংকারে কম্পমান, তখন স্বামীজীর এই অতি বাস্তব বক্তব্যটির অনুরণন করে বলাই যেতে পারে— বিজেপি ইতিমধ্যেই জিতে বসে আছে। কারণ এবার ভোটে বিরোধীদের মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে ততটা নয়, যতটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর সঙ্গে। ফলত হেরে বসে আছে বিরোধী সব শক্তিই। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই মুখে স্বীকার না করলেও হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, মোদীর শক্তির কাছে তাদের সম্মিলিত শক্তি তুচ্ছাতিতুচ্ছ। ফলত এবারের লোকসভা ভোট বিরোধীরা 'মোদীর এক্সপায়ারি ডেট এসে গিয়েছে ' বলে যতই চিৎকার করুন না কেন— ভোটের মূল গতিমুখ কিন্তু বিরোধী বনাম মোদী, আর সেটাই এবারের ভোটের মূল বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন হলো, দল ছেড়ে বিরোধীদের লক্ষ্য মোদী কেন? কেন তাদের মুখে একটাই স্লোগান— 'মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও।' কেন তারা যত 'দুর্নীতির দায়' চাপাচ্ছেন মোদীর ওপর? কেনই বা দলীয় রাজনীতির অঙ্ক শিকেয় তুলে বিরোধীরা সমস্বরে মোদীর বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে কোনো সীমাবদ্ধতা মানছেন না?

কারণটা পরিষ্কার। বিরোধীরা জানেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী যেমন ছিলেন বিজেপির একটি স্তম্ভ, ভারতীয় রাজনীতির নয়া জমানায় নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীও তেমনি একটি স্তম্ভ যিনি দেশ গড়তে জানেন। যিনি তোষণের রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থেকে ভারতীয়দের ভারতীয়ত্বের ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করতে জানেন। যিনি প্রয়োজনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অস্ত্রপ্রয়োগ করতে জানেন। যিনি জানেন, ভারতের উন্নয়নে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। 'চৌকিদার চোর হ্যায়' বলে 'স্বৈরাচারী মোদী'র বিরুদ্ধে বিরোধীরা যতই অস্ত্র শানান না কেন, তাঁরা জানেন, মোদীর অস্ত্র তাঁর ব্যক্তিগত সততা আর তাঁর মগজাস্ত্র যা চাণক্যের মতো ধারালো। অতএব একের বিরুদ্ধে একশো হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশ-মায়াবতী, তেজস্বী- নাইডু এবং অবশ্যই ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল এবং বিকৃত মস্তিষ্ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু এরা কি বিজেপি বিরোধী নয়?

এবারের ভোটে রাজনীতির অঙ্কের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, উত্তরটা হবে, যতটা বিরোধী হওয়ার দরকার ততটা নয়। কারণ বিরোধীদের কেউ জানে না, ২৩ মে লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর কোন বিরোধী দলকে হাত ধরতে হবে বিজেপির শুধু রাজনীতির ময়দানে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। সামান্য ব্যতিক্রম অবশ্যই কংগ্রেস। কারণ সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস এখনও বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ এবং অবশ্যই কিছুটা শক্তিধরও। কংগ্রেস তাই অতি প্রয়োজনেও বিজেপির সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করবে না কেবল রাজনৈতিক বাধ্যবাধ্যকতার নিরিখেই। কিন্তু বাকিরা? তাঁদের বাঁচতে হবে বিজেপির হাতে হাত মিলিয়েই। 'হয় মিলমিশ নয় ফিনিশ'-এ স্লোগানটাই হবে তাঁদের ভরসা ২৩ মে-র পরে। অতএব বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব কমাও। মোদীকে একঘরে করে দাও। এবারের মহারণে বিরোধীদের সেটাই স্ট্রাটেজি। তাই সকলের তিরের লক্ষ্য একজনই— ব্যক্তি মোদীজী।

কিন্তু এ কৌশল কতখানি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে? মোদী ক্ষমতায় এসেছেন মাত্র পাঁচ বছর। এর মধ্যে তিনি তীব্র বিরোধিতার পরোয়া না করেই এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করেছেন, যা গত দশ বছর ধরে চেষ্টা করেও রূপায়ণ করতে

পারেননি সোনিয়া গান্ধী পরিচালিত অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ। যেমন জিএসটি বলবৎকরণ, পুরনো নোট বাতিল রাতারাতি, কংগ্রেস আমলের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, মুসলমান সমাজ থেকে তিন তালাক প্রথার অবসানে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল বিরোধীদের কাছে সাপের ছোবলের মতো, কারণ এই প্রতিটি পদক্ষেপ দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের বুকে হাঁটু গেড়ে বসা দুর্নীতির অবসানে এক একটি চপেটাঘাত। পুরনো নোট বাতিল করায় বিরোধী দলগুলির কোটি কোটি কালো টাকার রমরমা এক রাতেই খতম। জিএসটি বলবৎ ছিল বিরোধীদের পোষ্য ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকির চেষ্টার শিকড়ে কুঠারাঘাত। ব্যাঙ্কে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত অর্থ প্রতারণার ফাইল ফাঁস করে দিল যে সব কটি দুর্নীতিই হয়েছে কংগ্রেস আমলে। একটার পর একটা। বোফর্সের দায়ে অভিযুক্ত, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত, সরকারি কোষাগার ভেঙে ব্যক্তি প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত, চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বিরোধী দলগুলির নেতানেত্রীরা প্রমাদ গুণলেন। অতএব অভিযোগ উঠল রাফাল চুক্তি নিয়ে। সেটা যখন প্রায় ভুল প্রমাণ হতে চলেছে, তখন আর বিরোধীরা মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ববোধ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরোধীরা প্রকারান্তরে পাক-সন্ত্রাসবাদকেই সমর্থন করে বসলেন সমস্বরে এবং যে সেনাবাহিনী জীবন বিপন্ন করে দেশ রক্ষার কাজে রত, তাদের অপমান করে বসলেন। ফলত বিরোধীদের কৌশল বুমেরাং হয়ে ফিরে গেল তাদের দিকেই। তার চেয়ে বড়ো ভুলটা ছিল— মোদীর বিরুদ্ধে অনুন্নয়নের অভিযোগ তুলে বিরোধীদের আস্ফালন। এই আস্ফালন যত তীব্র হয়েছে, ততই মানুষের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়েছে। কারণ মানুষ দেখেছে, অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতের প্রথম সফল বিজেপি সরকারই গড়েছিল দেশের চার বৃহৎ নগরীর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী স্বপ্নের সোনালি চতুর্ভুজ সড়ক পরিকল্পনা। আর এবার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে আর এক বিজেপি সরকার স্বপ্নের ফেরিওয়ালা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন শতাধিক প্রকল্প— যা সামগ্রিকভাবে প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের শরিক হয়ে উঠেছে গোটা দেশ জুড়ে। গরিব মায়েরা পেয়েছেন সম্মান, গরিব মেয়েরা পেয়েছে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। গরিব বৃদ্ধরা পেয়েছেন বেঁচে থাকার রসদ আর তরুণেরা পেয়েছেন স্বনির্ভরতার অস্ত্র। এভাবে এর আগে 'উন্নয়ন'-এর অর্থটাকে অর্থনীতির পরিভাষায় কোনও বিরোধী দল স্থায়িত্ব দিতে পারেনি। তাঁরা শুধু উপঢৌকনের অর্থনীতি কায়েম করে গরিবকে, বেকারকে, বৃদ্ধদের ভিখারি বানিয়েছে, হাত পেতে দান নিতে শিখিয়েছে। আর নিজেদের ভোটবাক্স ভরিয়েছে তাঁদের সমর্থনে। মানুষকে মানুষ হওয়ার মন্ত্র শেখায়নি। কারণ তাঁরা নিজেরাও সে মন্ত্র শেখেনি।

আরও আছে। একের পর এক নিজেদের তৈরি কৌশলে বিরোধীরা নিজেরাই ফাঁদবন্দি হয়েছে। মোদী সাম্প্রদায়িক, মোদী মুসলমান বিরোধী, মোদী দেশ ভাগ করতে চাইছেন— বিরোধীদের এই অভিযোগ যখন তুঙ্গে তখনই তিন তালাক প্রথা রদে বিল এনে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ধর্মীয় মতে অসহিষ্ণু নয়। তিনি সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদী। বরং বিরোধীরাই যে সাম্প্রদায়িক তার প্রমাণ দিলেন বিরোধীরাই যখন প্রকাশ্যে রাজ্যসভার অধিবেশনে কংগ্রেস-সহ অধিকাংশ প্রকাশ্যে ওই বিলের বিরোধিতা করলেন। বুঝিয়ে দিলেন, শুধু সামাজিক ফর্মূলাতেই নয়, রাজনীতির কৌশলে মোদীর কাছে এঁরা সকলেই শিশু।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও ঘটল প্রায় একইরকম ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর থেকেই মোদীর ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণ, রাজকোষের কোটি কোটি টাকা ব্যয় নিয়ে মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধীরা চাবুক হেনেছেন বারে বারে। মোদী সে আঘাত শতগুণে ফিরিয়ে দিয়েছেন পুলওয়ামা বিস্ফোরণে ৪০ জন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যুর পর যখন পাক সরকার এবং পাকসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রায় গোটা পৃথিবীই মোদীর পাশে এসে দাঁড়াল। সমস্ত বিশ্বের নেতৃত্ব সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং পাকিস্তানকে প্রায় কোণঠাসা করে দিলেন। বিরোধীরা এবারও কুপোকাত। তবু ওই যে বলে, ভাঙব তবু মচকাব না। তাই শবরীমালা মন্দির ইস্যুতে আয়াপ্পান গোষ্ঠীর চরম বিরোধিতার মুখে বিরোধী দলগুলি। বলা যায় না, এবার হয়তো কেরলও হয়ে উঠবে গেরুয়া। কর্ণাটকে জনতা দল ইউনাইটেড আর কংগ্রেস সরকার গড়লেও নিত্যনতুন নাটকের অবতারণা হচ্ছে প্রতিদিন। তিতিবিরক্ত মানুষ জবাব দেবেনই। রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে বিরোধীদের লপড়-চপড় বন্ধ। কারণ মোদী নিজে ব্যক্তিগত ভাবে রামমন্দির নিয়ে হৈচৈ কখনও করেননি। বরং রামমন্দিরকে ইস্যু না করেই পাকিস্তানে বার বার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাম ছিলেন, আছেন, থাকবেন ততদিন যতদিন রামায়ণ মহাকাব্য হয়ে থাকবে। কিন্তু পাক-সন্ত্রাসের সঠিক জবাবও ভারতীয়ত্বের জাগরণ ঘটাতে পারে তা বিরোধীদের পছন্দ হোক আর নাই হোক। ভারতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতিকে দীক্ষিত করা, তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা সংকীর্ণ রাজনীতি তো নয়ই, সাম্প্রদায়িকতাও নয়।

এর ওপর বিরোধীরা নিজেদের মুখে কালি মেখেছেন নিজেরাই নাগরিক পঞ্জীকরণে মোদীর ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা করে। নাগরিক পঞ্জীকরণ ইস্যুতে বিরোধীরা ভেবেছিলেন, মোদীকে ঘায়েল করার একটা অস্ত্র পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও বোঝেননি, তাঁদের অস্ত্রে ঘায়েল হবেন তাঁরাই। কারণ নাগরিক পঞ্জীকরণ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষের বিরুদ্ধেও নয়। এই ব্যবস্থার রূপায়ণ প্রয়োজন বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যারা পাকিস্তানের উস্কানিতে ভারতজুড়ে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করছে। সন্ত্রাসবাদের কোনও জাত থাকে না, ধর্ম থাকে না সেটা না বুঝে মোদী-বিরোধী স্লোগান তুলে বিরোধীরা নিজেদের মুখোশটাকে খুলে ফেলেছেন।

ভাববার সময় এসেছে। ভারতবর্ষের উন্নয়নে এখন প্রয়োজন নীতির রাজার আর সেই রাজার, দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে যিনি ব্যক্তির স্বার্থ ভুলে নীতির বদল ঘটাবেন। দল নয়, পশুশক্তির বল নয়, দলদাস নয়, বলদ নয়, দরকার মনুষ্যশক্তির পূর্ণ উন্মোচন। আর তা সম্ভব এক দল এক নেতার দ্বারাই। অন্যসব ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে যাবে। মনুষ্যশক্তির স্ফুরণ থেকে যাবে কল্পনাই। ■

এশিয়াটিক সোসাইটির ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

গত ৩ ফেব্রুয়রি কলকাতার প্রাচীনতম ভারত সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, রাষ্ট্রনেতা তথা সমাজ সংস্কারক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করে।

সোসাটির সম্পাদক ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণে বলেন, এই সংস্থার সঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অনুষ্ঠানে দিল্লির শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা ড. অনির্বাণ গাঙ্গুলি শ্যামাপ্রসাদ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর বিদ্যা, বিত্ত ও বিকাশ— এই তিনটি স্তম্ভের ওপর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। শ্যামাপ্রসাদের দর্শন ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগ ছিল প্রত্যেকের অধিকার বিদ্যার্জন, বিদ্যালাভের মাধ্যমে বিত্ত অর্জন, সেই বিত্তের অংশকে শিক্ষা ও দেশের বিকাশে নিয়োগ করা। উচ্চশিক্ষার বিস্তারে বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসারে তাঁর অবদান বিশদে ব্যাখ্যা করেন শ্রীগাঙ্গুলি। সোসাইটির সঙ্গে আজীবন জড়িত পূর্বতন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবন ও পারিবারিক স্মৃতি রোমন্থন করেন। বিশিষ্ট গবেষক ড. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী শ্যামাপ্রসাদ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতির ঝাঁপি খুলে অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনেন। ড. নিখিলেশ গুহের স্মৃতিচারণে উঠে আসে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকাকালীন কীভাবে ড. দীনেশ চন্দ্র সেনকে নিয়োজিত করে পূর্ববঙ্গ গীতিকা উদ্ধার করেন।

প্রবীণ অধ্যাপক ইশা মহম্মদের বক্তব্যের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুমিত দাস।

কাটোয়ায় গো-গ্রাম কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

সাংগঠনিক কাটোয় জেলার গোশুস্বা গ্রামে গত ২২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি গোসেবা বিভাগের গো-গ্রাম কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলা থেকে ১৬ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। গ্রামের কয়েকটি কৃষক পরিবার তাঁদের বাড়িতে কার্যকর্তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বর্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ গো-সেবা প্রমুখ ললিত আগরওয়াল, সহ গো-সেবা প্রমুখ গদাধর সিংহ সর্দার, দক্ষিণবঙ্গ গো-সেবা প্রশিক্ষণ প্রমুখ অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিস মণ্ডল। বর্গে গ্রামের বালক-বালিকাদের স্বচ্ছতার বিষয়ে, মা-বোনেদের গ্রাম বিকাশে তাদের ভূমিকা এবং কৃষকদের গো-আধারিত কৃষিকাজের বিষয়ে আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সেবা ভারতীর রক্তদান শিবির

গত ৫ ফেব্রুয়ারি সেবা ভারতী উত্তর মালদা ট্রাস্টের উদ্যোগে চাঁচোল বিবেকানন্দ ভবনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১১ জন রক্ত দান করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের গ্রাম বিকাশ প্রমুখ গৌতম মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন

সমাবেশ -সমাচার

বীরগতিপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানদের প্রতি সংস্কার ভারতীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও আলোচনা সভা

গত ১০ মার্চ কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক সংস্থা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে বিবেকানন্দ রোডের দধীচি ভবনের সভাকক্ষে সম্প্রতি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় বীরগতিপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল —'কাশ্মীর ভারতের, ভারতের কাশ্মীর'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পূর্বতন স্থলসেনাধ্যক্ষ জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী ও কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) সব্যসাচী বাগচী। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঠচক্রের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

সভার শুরুতে সংস্কার ভারতীর সংগীত গোষ্ঠী সংগীতের মাধ্যমে বীর জওয়ানদের প্রতি সংগীতাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং মঞ্চস্থ অধিকারীরা বীরগতিপ্রাপ্ত জওয়ানদের উদ্দেশে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বালক শিল্পী সোহম্ ভট্টাচার্য সৈনিকদের উদ্দেশে 'য়ে মেরে ওয়তন কে লোগোঁ' গীত পরিবেশন করে।

কর্নেল বাগচী তাঁর ভাষণে বলেন, 'ভারতের প্রতিটি মানুষ দধীচির আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ। আত্মত্যাগে সংকল্পবদ্ধ সেনাদের সঙ্গে তারা সবসময় রয়েছেন। স্বার্থান্বেষী কতিপয় রাজনীতিবিদ তা ভুলে গিয়ে দেশবিরোধী কথা বলছে। তারা ভারতবর্ষের হিয়া ভুলে গিয়েছে।' জেনারেল শ্রীরায়চৌধুরী বলেন, 'সুপ্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীর ভারতের, ভারতেরই থাকবে।' তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, ' ভারতের কিছু দেশবিরোধী নেতা সৈনিকদের কাজের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নেত্রীও রয়েছেন।' বক্তব্যের শেষে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের দেন কর্নেল বাগচী।

কলকাতার বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্থা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে। তার মধ্যে সংস্কার ভারতী, সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্ট, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্ট, রোটারি ক্লাব ক্যালকাটা নর্থ-ওয়েস্ট উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, এদিন মহর্ষি সেবা ট্রাস্টের অধ্যক্ষ কেদারদেও তিওয়াড়ি, উপাধ্যক্ষ রামদেও কাকড়া-সহ সব কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে একলক্ষ টাকার চেক সেনা কল্যাণ তহবিলের জন্য জেনারেল রায়চৌধুরীর হাতে অর্পণ করেন। সহযোগী সব সংগঠনের পক্ষ থেকে বীরগতিপ্রাপ্ত জওয়ানদের উদ্দেশে মল্যার্পণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাঠচক্রের ভরত কুণ্ডু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সুদীপ দত্ত।

নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে শিশু শিবির

উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যা মন্দিরের পরিচালনায় গত ৮ থেকে ১০ মার্চ শিশুদের সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে শিশু শিবিরের আয়োজন করা হয়। তিনদিন ব্যাপী শিবিরে শিশুদের এক সঙ্গে থাকা, খাওয়া, যোগব্যায়াম, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, খেলার মাধ্যমে অঙ্ক ও ইংরেজি শেখানো হয়। এছাড়া পুতুল ও বিভিন্ন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিশুদের স্থানীয় নদীর উৎস ও বাংলাদেশ সীমান্ত ঘুরিয়ে দেখানো হয়।

কোন্নগরের দেবী রাজরাজেশ্বরী

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

তিনশো বছরের কিছু বেশি হবে। আজকের হুগলি জেলার কোন্নগর শহর সে সময় এক বর্ধিষ্ণু, সমৃদ্ধ গ্রাম। গঙ্গার ধারে এখানে বাস ছিল এক সাধারণ ঘোষাল পরিবারের। একদিন এক জটা জুটধারী নবীন সন্ন্যাসী গঙ্গার ওপার থেকে এসে ঘোষাল পরিবারের কর্তার সঙ্গে দেখা করেন এবং গঙ্গাতীরের এক মাঠে নিয়ে এসে বলেন, দেবী রাজরাজেশ্বরী এখানে অধিষ্ঠিত হতে চান। ঘোষালকর্তা তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করুন এটাই দেবীর ইচ্ছা। এর পর স্বপ্নে দেখা দেবীর রূপের বর্ণনা দেন তিনি।

তখন কোন্নগরের প্রতিবেশী গ্রাম ন'পাড়ার খ্যাতি ছিল পণ্ডিতদের বসবাসের জন্য। পণ্ডিত-অধ্যুষিত বলে দ্বিতীয় নবদ্বীপের ন্যায় জনমানসে সমাদর ছিল। ঘোষাল কর্তা পণ্ডিতদের অভিমত জানার জন্য সেখানে লোক পাঠালেন। সেখান থেকে কয়েকজন পণ্ডিত এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সন্ন্যাসীর কথায় সায় দিলেন। দেবী যখন পূজা চাইছেন, তখন পূজা দেওয়াই কর্তব্য। দেবী এতে প্রসন্ন হবেন। যথা নিয়মে পূজা দিলে সবার কল্যাণ হবার কথা। কিন্তু ঘোষাল-কর্তা পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারলেন না। হঠাৎ এক অজানা অচেনা সন্ন্যাসীর আগমন, তন্ত্রমতে দেবীর পূজার নির্দেশ, এর উপর ভর করে তিনি নতুন এক পূজা প্রচলন করবেন, হিতে বিপরীত হবে না তো? ঘোষাল-কর্তা ভারী চিন্তায় পড়লেন।

কিন্তু দেবী স্বয়ং সমস্ত সংশয় দূর করতে ঘোষাল-কর্তার নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বললেন—আমি অতদূর থেকে তোর কাছে এলাম। আর তুই বিশ্বাস করতে পারছিস না? পূজার আয়োজন কর, তোর মঙ্গল হবে। স্বভাবত আর বাধা রইল না। সেদিন ছিল শ্রীপঞ্চমী তিথি। তন্ত্রোক্ত বিধানে সেই দিনই দেবীর কাঠামো নির্মিত হল। আর মাঘী পূর্ণিমায় 'আগচ্ছ সদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্ত্যভিঃ সহঃ পূজান গৃহান বিধিবৎ সর্বকল্যাণকারিণী' মন্ত্রে অভিষেক করে দেবীর পূজা শুরু হলো।

দেবী আসলে দশমহাবিদ্যার ষোড়শী রূপ ত্রিপুরসুন্দরী। ত্রিপুরা অসুরকে বধ করে তিনি ত্রিপুরসুন্দরী নামে ত্রিলোকে পূজিত হন। ষোড়শী কন্যার ন্যায় দেবীর কোমল মুখ, প্রাতঃ সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ। দেবীর পদতলে শায়িত মহাদেব। মহাদেবের নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্মের উপর দেবী সুখাসনে উপবিষ্টা। দেবী চতুর্ভুজা, দক্ষিণ দুই হস্তে তির ও বজ্র, বাম দুই হস্তে ধনুক ও সাপ। দুই পাশে জয়া ও বিজয়া দুই সখী। নীচে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবরাজ ইন্দ্র।

ঐতিহ্য মেনেই শ্রীপঞ্চমীর দিন কাঠামো পূজা করে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়। মন্দিরেই প্রতিমা নির্মাণ হয়। প্রথমে ছিল মাটির ঘর, তাতে খড়ের চাল। বর্তমান যে মন্দির তা ষাট-সত্তর বছর পূর্বে গড়ে উঠেছে। মন্দিরের উচ্চতা চল্লিশ ফুট। ২৫ ফুট উচ্চতার দালান বাড়ি শ্রেণির নির্মাণের উপর ১৫ ফুট উচ্চতার একটি 'রত্ন' বা চূড়া মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করেছে।

মাঘীপূর্ণিমার সকালে আবরণ উন্মোচন করে পূজা শুরু হয়। তন্ত্রমতে পূজা হলেও পশুবলি হয় না। দ্বিতীয় দিন যজ্ঞ হয়। পূজাকে ঘিরে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা বসে তা চারদিন ধরে চললেও, দ্বিতীয় দিন পূজার শেষে সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার নির্দিষ্ট ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। পূর্বে বিসর্জনের পূর্বে বেড়া অঞ্জলি দেওয়া হতো। দেবীকে পরিক্রমা করতে করতে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রথাই বেড়া অঞ্জলি। বর্তমানে প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়িয়েই অঞ্জলি দেন ভক্তগণ।

রাজরাজেশ্বরী পূজার অন্যতম বিশেষত্ব হলো, প্রথমদিন দেবীর সঙ্গে সত্যনারায়ণও পূজা পান। এই পূজার পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। এটি ১৯৭৮ সালের ঘটনা। বর্তমান পূজারি সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা পণ্ডিত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মায়ের পূজা করতেন। দ্বিতীয়দিন, পূজার শেষে সুতো কেটে নিরঞ্জনের সময় তাঁর মনে হলো এখন সুতো কাটা ঠিক হবে না। কেউ হয়তো আসছে। একটু অপেক্ষা করা দরকার। কাউকে কিছু না বলে সাত পাঁচ ভেবে তিনি উঠে পড়লেন পূজার আসন থেকে।

কিছুক্ষণ পর সত্য সত্যই নবগ্রাম থেকে এক মহিলা পূজার উপকরণ নিয়ে হাজির। তিনি জানালেন, এখানে সত্যনারায়ণের পূজা করার জন্য তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন। পূজক বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথায় মান্যতা দিয়ে সত্যনারায়ণের পূজা করেন। সেই থেকে দেবী রাজরাজেশ্বরীর সঙ্গে সত্যনারায়ণের পূজা চলে আসছে।

ঘোষাল পরিবার কর্তৃক রাজরাজেশ্বরী পূজা প্রবর্তিত হওয়ায়, প্রথমে তা ছিল পরিবারভিত্তিক। ১৯২২ সালে কোন্নগরবাসীর এক মিলিত সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পূজা কমিটি গঠিত হয় এবং এর পর থেকে পূজা কমিটির উপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। স্বভাবে বারোয়ারি হয়ে উঠলেও সর্বজনীন পূজার মতো তা অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। পারিবারিক পূজার আন্তরিকতার ছোঁয়া আজও লেগে আছে। পারিবারিক পূজার নিষ্ঠা নিয়ে শহরবাসী মিলিত হন। শুধু এই শহরবাসীই নন, চাইলে যে-কেউ মাতৃপূজায় অংশ নিতে পারেন, মায়ের পরনের বেনারসি শাড়িও দিতে পারেন, যা পরে কোনো দরিদ্র বিবাহযোগ্যা কন্যাকে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়।

'সর্বমন্ত্রময়ী দেবীং সর্বসৌভাগ্যসুন্দরী' রাজরাজেশ্বরী পূজা ও উৎসব কোন্নগরের প্রাচীন ঐতিহ্যের অঙ্গ। বঙ্গভূমি জুড়ে শক্তি আরাধনার বহু নিদর্শন থাকলেও মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শক্তির আরাধনা এই শহর ছাড়া অন্যত্র বিরল। ❚

সর্বজনীন মিলন উৎসব দোল

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনেও সততই রণিত এই ঐক্যের সুর। একারণেই ভারতের প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই দেখা যায় আধ্যাত্মিক চেতনা এবং লৌকিক জীবনবোধের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন। একের সাধনার ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় তাই বহুজনের হিত ও সানন্দ যোগদানের মধ্যেও। ধর্মীয় অনুষ্ঠান তখন সব ভেদাভেদের ইতি ঘটায় সকলের অবাধ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও মিলনের সঙ্গমে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সবরকম বিধিনিষেধের ঠুনকো বেড়া ভেঙে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠার উৎসব দোলযাত্রা—ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে যা পালিত হয় পবিত্র হোলি হিসেবেও।

দোল এবং হোলির উৎসবে রয়ে গিয়েছে সামান্য কিছু পার্থক্য। সেটাও অন্তরঙ্গে। বহিরঙ্গে কিন্তু দুই-ই মিলে মিশে একাকার। সেই সম্মিলিত বাঁধনহীন একাত্মতাই দোল বা হোলিকে পরিণত করেছে ভারতের অন্যতম সর্বজনীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

আপাতদৃষ্টে দোল বা হোলির রয়েছে দু'টি অঙ্গ। একটি হলো ধর্মীয় অনুষ্ঠান—পূজা, হোম। অন্যটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভেদের সব কথা ভুলে এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই মানুষ এগিয়ে আসে পরস্পরের কাছাকাছি। পিচকিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত সুবাসিত রঙের ধারায় যেমন মানুষ হয় স্নাত—রক্তিম, তেমনই আবির গুলালে বিচিত্রিত হয়ে মেতে ওঠে সকলে, সংগীতে—কীর্তনে—আনন্দ অনুষ্ঠানে। মনের সব কালিমা এদিন এভাবেই হয় দূরীভূত। নতুন রঙে—নতুন করে যেন শুরু মানুষের অগ্রগমন পরম শুভের পথে। মূলত, এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র দোলযাত্রা হয়ে ওঠে সবুজ প্রাণের উৎসব। বসন্তের মৃদুমন্দ বায়ু চারিদিক হয় আমোদিত। নানা বর্ণের পুষ্পে পুষ্পে ভরে ওঠে সবুজ বনানী। শোনা যায় কোকিলের প্রাণ উদাস করা কুহু কুহু ডাক। ভ্রমরের গুঞ্জনে ধ্বনিত মিলনের মধুর গীতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমার এমনই এক মধুলগ্নে দোলযাত্রা আসে সকলকে রাঙিয়ে দিতে—মাতিয়ে দিতে।

দোলযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের চিরকালীন প্রেম ও লীলার কথা। ফাল্গুনের এমনই এক রঙিন দিনে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মেতে উঠেছিলেন গোপবালা ও গোপবালকদের সঙ্গে সহর্ষ এক ক্রীড়ায়—যা রঙিন হয়ে ওঠে রঙে ও আবিরে—ফাগে-গুলালে। সেদিন এই ক্রীড়া শেষে গোপবালকরা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে দোলায় বসিয়ে দিতে থাকে দোল। মেতে ওঠে নবীন প্রাণের কীর্তনে। দোলায় উপবিষ্ট রাধা-কৃষ্ণের পায়ে আবির দিয়ে সকলে হয়ে ওঠে কৃত কৃতার্থ। আর সেদিনের সেই সুখ মুহূর্তের কথা মনে রেখেই মদন মোহন—রাধারমণ বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধাকিশোরী বিনোদিনী শ্রীরাধিকা দোলায় বসিয়ে মন্দির থেকে আনা হয় দোলমঞ্চে। যেখানে দোলায় বসিয়ে করা হয় বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান। রথে বামনকে দর্শনে যেমন পুর্নজন্মের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তেমনই—তস্মিনকালে হরিং দৃষ্টা সর্ব্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে—সেসময় দোলায় আসীন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলে সমস্ত পাপ থেকে ঘটে মুক্তি, দূর হয় সব বিপদ অন্তিমে পাওয়া যায় বিষ্ণুলোক।

রাধা-কৃষ্ণের এই দোলযাত্রায়—বিগ্রহকে দোলায় বসিয়ে করা হয় পূজার্চনা। দোলানো হয় যুগল মূর্তির দোলনাকে। সেই সঙ্গে হয় রঙের খেলা। এসম্পর্কে এক পুরা কাহিনি, এই রঙের খেলার প্রবর্তন করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং সে প্রবর্তনের পেছনে সক্রিয় ছিল এক ধরনের প্রণয় ঈর্ষা।

রাইকিশোরীর প্রেমে বিহ্বল গোপাল-কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি যেন রাধিকার মনে দেখেন একটু গর্বের ভাব। শ্রীকৃষ্ণর গায়ের রং কালো, কিন্তু রাধারানি হলেন

গৌরবর্ণা। এই গৌরবর্ণের জন্য রাধার অন্তরে ছিল এক ধরনের অহমিকা। প্রণয় কলহের কালে অনেক সময়ই তিনি রঙের খোঁটা দিতেন। কৃষ্ণকে কালো বলে উপহাস করতেন।

রাধিকার এই উপহাস কৃষ্ণকে যেন একটু ক্ষুব্ধ করে তোলে। মনে মনে রাধিকাকে জব্দ করার একটি ফন্দি আঁটেন তিনি। সেই মতলব অনুযায়ী মধুমাসের এক পূর্ণিমাতিথিতে তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে আচমকাই রাধা এবং অন্যান্য গোপবালিকাদের মুখ ও দেহ কালো এবং অন্যান্য রঙে বিচিত্রিত করেন। নিজেদের সেই রঙ মাখানো মুখ দেখে রাধা ও অন্যান্য গোপবালিকা প্রথমে কান্নাকাটি করতে থাকেন। তারপর কপট ক্রোধে তাঁরাও কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদের রঙ মাখাতে থাকেন। মেতে ওঠেন সহর্ষ নৃত্যগীতে। রাধা ও কৃষ্ণের রঙিন মূর্তি দোলনায় বসিয়ে নানা রং রসিকতায় আনন্দ- উচ্ছল হন সকলে। সেদিনের সেই সুখস্মৃতি ভক্তহৃদয়ে ঘটায় অপূর্ব ভাবের প্রকাশ। তারই পরিণতিতে দোলযাত্রায় সকলে মাতেন রঙের খেলায়। মুখর হন নৃত্য-গীতে।

এই রঙের খেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও কিছু পৌরাণিক কাহিনি। সতীর দেহত্যাগের পর তাণ্ডবনৃত্যে মেতে ওঠেন মহাদেব। তাঁকে শান্ত করতে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে ছিন্নভিন্ন করেন শিবের কাঁধে থাকা সতীদেহ। শান্ত শিব হন সমাহিত। স্তব্ধ হয় সৃষ্টি পর্ব।

মহাদেবের সেই মহাসমাধি ভাঙানোর জন্য দেবতারা নির্দেশ দেন কামদেবকে। দেব-আজ্ঞায় আড়াল থেকেই মদনদেব নিক্ষেপ করেন তাঁর কামশর। ভঙ্গ হয় মহাদেবের ধ্যান। আর সেই মুহূর্তে তাঁর সেই রোষদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভাবে দগ্ধ হয় রতিপতি মদন। তাঁর সেই দেহভস্ম নিয়ে হাহাকারে চারিদিক ভরিয়ে তোলেন মদন-জায়া রতি। এই ঘটনা নাকি ঘটেছিল ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে। আর তারই স্মরণে ওইদিন সকলে মাতেন নানা রঙের খেলায়। পরস্পরকে মাখান ছাই-কাদা ইত্যাদিও।

অন্য কাহিনি মতে, বালক শ্রীকৃষ্ণকে মারতে বসে নিহত হয় পুতনা ও ধুন্ধুভি। অশুভের বিরুদ্ধে শুভের জয়ের এই ঘটনার অনুসরণে সমস্ত পাপ ও অশুভের বিনাশের প্রত্যাশায় পালিত হয় এই দিনটি।

এইসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট, দোল হলো একইসঙ্গে কিশোর প্রেমের প্রথম প্রকাশের অনুষ্ঠান। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির বিজয়েরও প্রতীক এই উৎসব। আবার একই সঙ্গে বলা হয় এটি হলো নতুন ফসল তোলার সঙ্গে যুক্ত একটি কৃষি উৎসব। সব মিলিয়ে দোল হলো একইসঙ্গে পূজা-হোমের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এক সামাজিক মহামিলনের উৎসব। একে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয় গীতি ও সংগীতের এক নবধারাও।

রঙের উৎসব দোল। বঙ্গদেশসহ পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এটি পালিত হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন। দোলযাত্রা নামেই প্রসিদ্ধ এটি। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন হিন্দিভাষী অঞ্চল সহ সারা ভারতে এটি হোলি নামেই বেশি পরিচিত। ওইসব অঞ্চলে উৎসবটি প্রতিপালিত হয় পূর্ণিমার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদে। দোল বা হোলিকে কোথাও কোথাও বহ্নুৎসব বা বসন্ত উৎসব নামেও অভিহিত করা হয়।

উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে সারা ভারতেই প্রতিপালিত হয় এই উৎসব। ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুরিনাম, ত্রিনিদাদ, চিকাগো, ব্রিটেন, সংযুক্ত আমির শাহি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রায় বিশ্বে পালিত হয় এই হোলি। বস্তুত যেখানেই ভারতীয়দের বাস সেখানেই সকলে মাতেন রঙের উৎসব দোল বা হোলিতে। অনেকে ভারতের এই হোলি বা রঙের উৎসবকে তুলনা করেন ভ্যালেনটাইন ডে বা এপ্রিল ফুলস ডে-র সঙ্গেও।

দোল বা হোলিতে খেলা হয় রং—সাধারণত লাল ও হলুদের থাকে প্রাধান্য। বলা হয় লাল ও হলুদ হলো আগুনের রং আর দোলের আগের দিন চাঁচর বা বুড়ির ঘর পোড়ানো উৎসব বা বহ্নুৎসবের আগুনের প্রতীক হিসেবেই এই দুটি রং-ই বেশি করে ব্যবহার করা হয়।

এই সম্পর্কে আরও এক পৌরাণিক কাহিনি, জন্মের পরই ক্ষুধার্ত হনুমান ফল ভেবে আকাশের সূর্যকে গিলে ফেলে। ফলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। সূর্যকে উদ্ধারের জন্য দেবতারা হনুমানকে জাগাবার জন্য পরস্পরের দিকে রঙিন জল কুলকুচি করতে থাকেন। তা দেখে হাসে হনুমান—আকাশে আবার উদিত হয় সূর্য। এর থেকেই দোলে ব্যবহার বেশি হয় লাল—হলুদের।

দৈত্য অধিপতি, বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু তাঁর বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে কোনোভাবেই মারতে না পেরে শেষে বোন হোলিকাকে নির্দেশ দেন প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনের মধ্যে বসতে। আগুন হোলিকাকে দগ্ধ করতে পারত না। কিন্তু সেদিন হোলিকাই পুড়ে ছাই হয় আর অক্ষত থাকে প্রহ্লাদ। এই হোলিকা দহন থেকেই দিনটি হোলি নামে পরিচিত।

দোল বা হোলি কোথাও দু' দিনের উৎসব, কোথাও কোথাও আবার এটি প্রতিপালিত হয় দশদিন ধরে।

ভগবত পুরাণ ছাড়া এই দোল বা হোলির উদ্ভবের উৎস রয়েছে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা সূত্র, কাঠক গৃহ্যসূক্ত, নারদীয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থেও।

সবমিলিয়ে দোল বা হোলি শুধু একটি ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান নয়—এটি হলো সার্বজনীন একান্ত মিলনের উৎসব। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

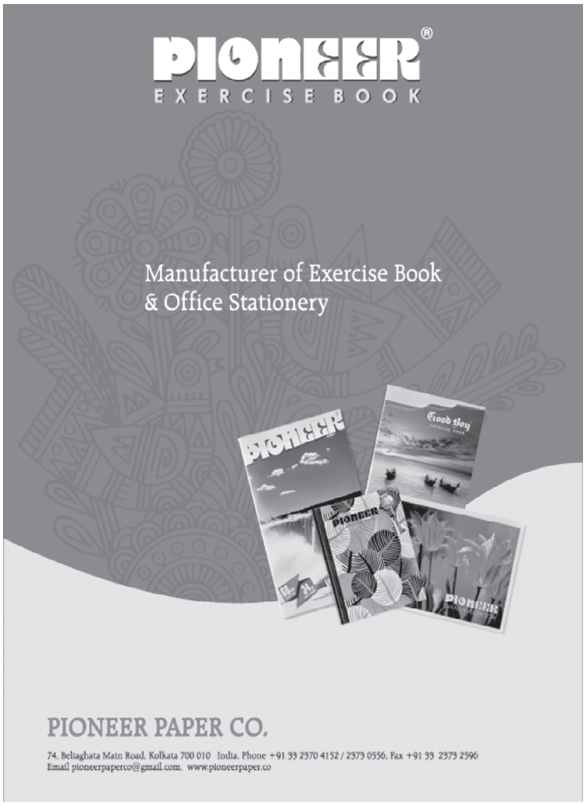

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

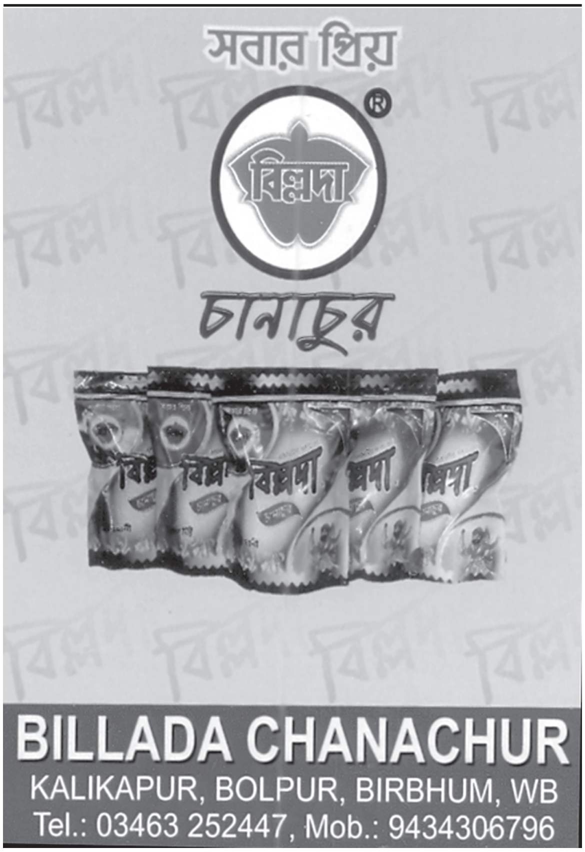

কুম্ভের ভাঙা হাটে

বিজয় আঢ্য

শেষমেশ বেরিয়েই পড়লাম। নানা কাজের চাপে এবারে কুম্ভে যেতে পারব কিনা তা নিয়ে সংশয়ে ছিলাম। কিন্তু শিব চতুর্দশীর শেষ স্নানটা করার সুযোগ এসে যাওয়ায় ওটা আর হাতছাড়া করা গেল না। রওনা দিলাম কুম্ভের উদ্দেশে। এর আগেও প্রয়াগের কুম্ভমেলায় দু'বার এসেছি। দু'বারই মেলা প্রাঙ্গণে গড়ে তোলা ভিএইচপি-র শিবিরেই ছিলাম। এবার ভিএইচপি-র শিবির ইতিমধ্যেই গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু ভিএইচপি কেন, বহু সংস্থার শিবিরই এখন শুনশান। তথ্য হলো, এবারে প্রায় ৬ হাজার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল। আসলে শাহি স্নান আর নেই। তবে শিবচতুর্দশীর স্নান আছে। এবং তা কুম্ভের কাছাকাছিই পড়েছে। তার উপর সোমবার— বাবার জন্মবার। তাই এবারও যে উপছে পড়া ভিড় হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

কালীমার্গ দিয়ে সঙ্গমে যাওয়ার মুখেই বিশাল মিডিয়া সেন্টার। ব্যবস্থায় উত্তরপ্রদেশ সরকারের তথ্য দপ্তর। প্রথমে সোজা সেখানেই গিয়ে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য দুটো— এক, মেলা 'কভার' করার জন্য 'ইউপি'-সরকারের প্রেস কার্ড সংগ্রহ, দুই, দু' রাত্রির জন্য মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। তা সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে শেষপর্যন্ত দুটোরই গতি হলো। ভাগ্যটা ভালো বলতে হয়। সেদিনই প্রয়াগের ডি এম এবং এস পি-র (প্রয়াগের মেলা প্রাঙ্গণকেই একটা জনপদ বা ডিস্ট্রিক্ট বলে ধরা হয়েছিল) উপস্থিতিতে প্রেস কনফারেনস ছিল। প্রেসকে তাঁরা যা জানালেন তার সারসংক্ষেপ এই— শিবরাত্রির পরেরদিন মানে ৫ মার্চই মেলার শেষদিন। প্রায় দু' মাস ধরে চলা

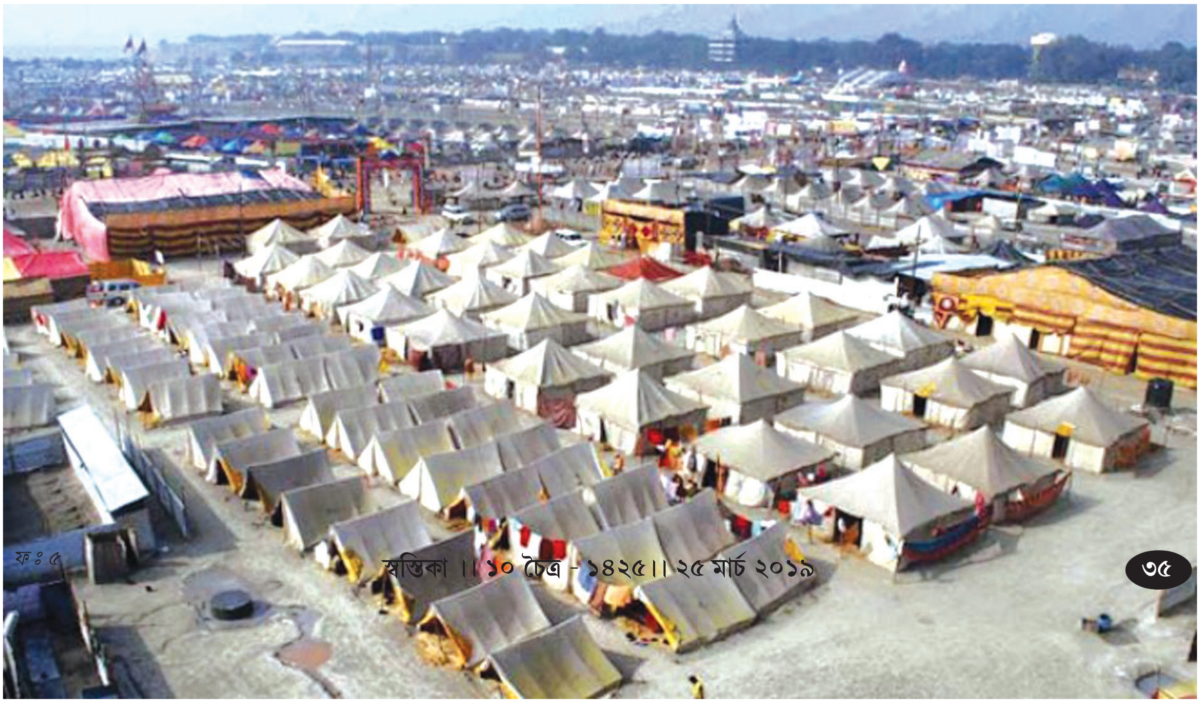

মেলার বড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এখনও পর্যন্ত ২২ কোটি মানুষ স্নান করেছেন। শিবচতুর্দশীতে আরও ১ কোটি পুণ্যার্থী আসার সম্ভাবনা। রাত ১টা বেজে ২৬ মিনিটে শিবচতুর্দশী তিথি শুরু। তাই আজ রাত থেকেই পুণ্যার্থীদের ঢল নামবে। এজন্য যানবাহন অনেক দূরেই থামিয়ে দেওয়া হবে। হারিয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা এবারে ২৯, ৩০৭। এর মধ্যে এখনও ৭৬২ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মেলা নিয়ে ৯০ মিনিটের একটা তথ্যচিত্রও তৈরি হয়েছে এবং তা দেখার জন্য তাঁরা অনুরোধও জানালেন।

প্রেস কনফারেন্স-এর চা-পর্ব শেষ করে মিডিয়া সেন্টারের তৈরি ঘেরা জায়গার একটা নির্দিষ্ট তাঁবুতে জিনিসপত্তর রেখে সঙ্গী সৈকতদার সঙ্গে রওনা দিলাম সঙ্গমের দিকে। তিন কিলোমিটার হাঁটা পথ। ধীরে সুস্থেই হাঁটছি। পথে কিন্তু এরই মধ্যে তীর্থযাত্রীর ঢল নেমে এসেছে। সঙ্গমের কাছে ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছে দেখলাম সঙ্গমের চারপাশ আলোয় ভেসে যাচ্ছে। যেদিকে তাকাই শুধু আলোয় ভেসে যাওয়া এক বিস্তীর্ণ তাঁবুর শহর। আজ আর বেশি দূর এগোতে ইচ্ছে হলো না, কেননা কাল এই পথ দিয়েই সঙ্গমে স্নানে যেতে হবে। তাই পায়ে পায়ে তাঁবুতে যখন ফিরলাম তখন ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর ছুঁইছুঁই করছে।

ঘুম ভাঙালো 'হর হর গঙ্গে'-র জয়ধ্বনিতে। সকাল আটটা নাগাদ যখন রওনা দিলাম তখন বিপুল জনস্রোত। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, শুধু মানুষ আর মানুষ। মানুষের এক চলমান স্রোত। কারও পিঠে ব্যাগ, কারও হাতে ঝোলা, কারও মাথায় বোঁচকা। কারও কোলে শিশু। কারও হাত ধরে রেখেছে কচি-কাঁচাকে, কারও হাত ধরে চলেছেন কোনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। একটা দল যাচ্ছে— তাদের সবার একজনের সঙ্গে একজনের কাপড় বাধা। আবার একটা দলকে দেখলাম— বিশাল লাঠির ডগায় হলদে কাপড় বাধা। সেটা দেখেই দলের বাকিরা চলছে। এদের মধ্যেই একজনকে দেখলাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগিয়ে চলেছেন, তার মা-কে পাওয়া যাচ্ছে না। ভুলে-ভটকে শিবির থেকে অহরহ হারানো লোকেদের উদ্দেশে ঘোষণা হচ্ছে— 'মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলার সীতাদেবী আপনার মেয়ে মহাত্মা গান্ধী মার্গ থানায় অপেক্ষা করছেন। আপনি এখানে আসুন'। প্রশাসনের তরফেও নানা ঘোষণা— 'আপলোগ স্নানকে বাদ তুরন্ত জায়গা খালি করেঁ, তা কি অন্য পুণ্যার্থীয়োঁ কো স্নানকে লিয়ে অবসর মিলে'। পথের দু'পাশে গঙ্গাপূজার সামগ্রী, শীতের পোশাক, নানা কিসিমের দোকান। আর দেদার বিক্রি হচ্ছে পুণ্যার্থীদের গঙ্গাবারি নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা সাইজের প্লাস্টিকের বোতল। পোশাক-আশাক, ভাষা-বুলি, খান-পান, গরিব-আমির, পড়-আনপড়— কত রকমের মানুষ যে চলছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই চলমান ভারতবর্ষের সঙ্গে আমরাও পা মেলালাম। না, কোনও ক্লান্তি নেই। আছে এক তীব্র ব্যাকুলতা। সঙ্গমে অবগাহন।

সঙ্গমে পৌঁছে দেখি দাঁড়ানোর কোনও স্থান নেই। থিকথিক করছে ভিড়। তীর ধরে গঙ্গার উপরে বাঁশের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আছে সিভিল ভলেন্টিয়ার। সুরক্ষার ব্যবস্থাটা বেশ আঁটোসাটো। বস্তুত বড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটেওনি। সারা জায়গাটা জল-কাদায় ভর্তি। তারই মধ্যে লোকেরা জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানে যাচ্ছে আবার ফিরছে। কেউ কেউ নৌকো করে মাঝ নদীতে যাচ্ছে, যেখানে যমুনা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। যাত্রীপিছু ষাট টাকা। তা আমরাও একে একে স্নান করলাম। এই বারের গঙ্গা— অবিরল নির্মল গঙ্গা। সরকারের চেষ্টায় কুম্ভের এই ক'দিনের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে স্নানার্থী চার-পাঁচজন যুবকের একটা দলকে দেখলাম। তাদের একজন স্নান করতে যেতে রাজি নয়। বাকিরা তাকে বোঝাচ্ছে— 'আরে যাও না ইয়ার, মজা আ যায়গা।' এত কষ্ট করে এত মানুষ যে এখানে এসেছেন, কারও মুখে কোনও বিরক্তি নেই। সবারই চোখে-মুখে এক প্রসন্নতা। তৃপ্তির আভাস। এই মঙ্গল-ভাবনাই এদেশের আত্মা যা যুগ যুগ ধরে এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমাদের জাতিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। বিশ্বকেও আত্মীয় জ্ঞান করেছে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

এবার ফেরার পালা। লেটে হনুমান মন্দিরের দিক দিয়ে ফেরার পথ। ভিড়ের চাপে লেটে হনুমান মন্দির ও অক্ষয় বট দর্শন এখন বন্ধ। আগের দু'বারে এসব অবশ্য দর্শন করে গিয়েছি। আগে যখন এসেছি তখন কুম্ভ ছিল জমজমাট। এখন ভাঙা হাট। সব আখড়াই প্রায় গুটিয়ে নিয়েছে। আছে শুধু কিন্নর-সন্ন্যাসিনীদের আখড়া। এই আখড়ার প্রধানের মিলেছে মহামণ্ডলেশ্বরের স্বীকৃতি। হিন্দু জাতি যে 'অল ইনক্লুসিভ' এটা তার এক প্রমাণ। হাজার হাজার বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই জাতির জীবনধারা যে বয়ে চলেছে, তার কারণ বোধহয় এটাই। সকলকে আত্মসাৎ করে নেওয়ার ক্ষমতা এর অসাধারণ— ঠিক মা গঙ্গার মতো। অসংখ্য নদী গঙ্গাতে এসে মিশলেও সকলেই শেষপর্যন্ত গঙ্গা হয়ে যায়।

এবারের মেলার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো সুরক্ষা আর স্বচ্ছতা। প্রায় দু'মাস (মকরসংক্রান্তি থেকে শিবচতুর্দশী) ধরে চলা এই মেলায় প্রায় ২৪ কোটি মানুষকে সামলানো নিঃসন্দেহে এক কঠিন কাজ। চার-পাঁচদিনের বাংলার দুর্গোৎসবে বিশেষত কলকাতায় আমাদের রাজ্যপ্রশাসনের কী অবস্থা হয়, তা জানি। তাই ইউপি-র যোগী বা কেন্দ্রের মোদী সরকারকে সাবাস দিতে হয়। আর একটা দেখার মতো বিষয় হলো— কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচার। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বিশাল বিশাল সেন্টার যেমন রয়েছে, তেমনই অসংখ্য হোর্ডিং ও গ্লোসাইন বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বিশাল বিশাল সাইজের কাট আউট। কুম্ভ পর্বের পর দেশ জুড়ে যে আর এক রাজনৈতিক কুম্ভ শুরু হতে চলেছে, এ তারই সূচনা। সারাদেশে, বিশেষত সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর জাতীয়তার একটা যে অন্তর্লীন স্রোত বইছে তা বেশ টের পাওয়া গেল। মেলার মধ্যেই ধ্বনি উঠছে, 'জয় শ্রীরাম'। 'ভারতমাতা কী জয়'। মোদী এখন হিরো। তা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী থেকে সুটেড-বুটেড যুবক— সবারই এক-রা। ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে তাঁবুতে ফিরলাম, আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালেই ফিরছি। কিন্তু কী জানি কেন, বারবার ঘুরেফিরে মনে আসছে— শেষ হয়েও না হইল শেষ। ■

দেশভক্তির পুনর্জাগরণ

তরুণ বিজয়

এরকম কখনও ঘটেনি যে বায়ুসেনার পক্ষ থেকে ট্যুইটারে সেনাদের অভিনন্দন সূচক কবিতা লিখে প্রসারিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের সংবাদমাধ্যম তাকে মান্যতা দিয়ে খবর ছেপেছে। যখন দেশের উপর বাইরে থেকে হামলা হয় বা দাসত্বের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে— সাধারণত তখন দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এটাও বাস্তব সত্য যে ভগৎ সিংহ যখন ফাঁসিতে ঝুলছে তখন দেশের রায়বাহাদুর নিজের দরবারে সবাইকে নিয়ে বিলাস করছে।

আজকের পরিস্থিতি আলাদা, বর্তমানে দেশভক্তির পরিচয় কেবলমাত্র দেশের সীমা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া নয়, শত্রুর দেশের মধ্যে প্রবেশ করে যেসব জঙ্গি আড্ডা তৈরি করেছে তা নষ্ট করা নয় বরং সংবাদ জগতের বিভিন্ন নেতাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসের উপর হামলার কড়া জবাব দেওয়া। এই প্রথমবার দেখা গেল যে তথাকথিত সেকুলারবাদীরা মুখ লুকিয়ে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে— গত সাত দশক ধরে এযাবৎ যারা দেশের বৌদ্ধিক পরিবেশে একচ্ছত্র রাজ করছিল। এইরকম স্থিতি কদাচিৎ দেখা যায়, যেমন ঔরঙ্গজেবের পতনের পর মহারাজা শিবাজীর উত্থান হয়েছিল।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ হিন্দু, সেইজন্য সকল মত ও সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। হিন্দুদের উপর রেগে যাওয়া বা হিন্দুদের নিয়ে মজা করার অধিকার সবারই আছে। দু' লাখের বেশি কাশ্মীরি মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী সারাদেশে পড়ছে— কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছে বা নিজের খরচে এবং বিভিন্ন শহরে বাস করছে। অনেক ছেলেমেয়ে শাল বা হস্তকলার জিনিস বিক্রি করছে, সরকারি বেসরকারি মাধ্যমে সংবাদদাতার কাজ করছে। লক্ষ্ণৌতে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে আর সেকুলার মাধ্যমগুলি 'কাশ্মীরিদের উপর হামলা' বলে সারাদেশে হল্লা ফেলে দিয়েছে। অথচ সারাদেশে তারা সুরক্ষিত নির্ভয়ে আছে— তার কোনো চর্চা নেই। আমি নিজে দেরাদুনে কাশ্মীরি মুসলমান ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি— তারা পুলিশের থেকে সবরকম সুরক্ষা পেয়েছে। এই ধরনের ঘটনা ও হিন্দু বিরোধিতাকে যারা সেকুলারবাদ আখ্যা দিয়েছে, রাফাল বিমান কেনার বিষয়টিও তার এক উদাহরণ। এসব তারাই করছে যারা আর্থিক অপরাধে অপরাধী বা বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থায় ফেঁসে গেছে, যারা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা মজবুত করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। এরা আংশিক বা অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে যেসব কথাবার্তা

বলছে তাতে ভারতীয় সৈন্যদের মনোবল বাড়ছেই না, বরং বাড়ছে শত্রুপক্ষের।

হিন্দুদের অপমান করে যেমন দেশ চলানো সম্ভব নয় তেমনই কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে তিরস্কার করে সংবিধান বাঁচনো সম্ভব নয়। বিভিন্ন দল ব সংগঠনে হিন্দু মানসিকতা ভারতের শক্তি, দুর্বলতা নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত হিন্দুর সংবেদনশীলতাকে প্রগতিশীলতার মাপদণ্ড ধরে আসা হয়েছে— এখন খবরে দেখানো হচ্ছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এই প্রথমবার কুম্ভ স্নান করলেন বা কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরের ভূমি পূজন করলেন। আমেরিকার জনগণ এই প্রথম জানল যে ভারতে এবার একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি হোয়াইট হাউসের বিখ্যাত লোভনীয় খাবার ত্যাগ করে নবরাত্রি পালন করছেন, শুধু জলপান করে দিনপাত করছেন এবং লন্ডন থেকে সাংহাই সর্বত্র ভারতীয় ভাষায় কথা বলছেন।

যে সমস্ত কাশ্মীরি মুসলমানরা ওখানকার হিন্দুদের (যাদের মুসলমানেরা পূর্বজ মনে করত) বিভাজনের সময় মায়াকান্না করছিল, ওরা আশা করেছিল যে দেশের হিন্দুরা ওদের সঙ্গে প্রেম ও আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার করবে। হয়েছেও তাই। অন্যদিকে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান বা দিল্লির কোনো সেকুলার পত্রকার পাঁচ লাখ হিন্দুদের কাশ্মীর থেকে বর্বরতার সঙ্গে বিতাড়নের বিরোধিতা করেছে কিংবা মুসলমান জেহাদির কট্টরতা বিরোধ করেছে কি?

দেশভক্তি বর্তমানে হিন্দুর উত্থানের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে অধিক প্রভাবিত হয়েছে। এখন চার্চের আর্চ বিশপ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলামি মৌলানারা স্থানীয়ভাবে ছোটো ছোটো একতার পরিবেশ তৈরি করছে, কারণ ওদের ভয় হচ্ছে— ধীরে ধীরে হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরণ করা এবং ওদের উপর জনসংখ্যাসম্বন্ধী প্রভাব বাড়ানোর ষড়যন্ত্র ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংবিধানের প্রাধান্য, রাষ্ট্রের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান সকলে সমান ভাব তখনই সম্ভব যতক্ষণ ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। যেদিন হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে তখন ভারত অভারত হয়ে যাবে। যারা এসব কথা বলতে শুনতে চায় তারা ১৯৪৭-এর নরসংহার, মীরপুর বা বহাবলপুরে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনি স্মরণ করতে চায় না। তারা সেই রকম নিয়মাবলী চায় যাতে ধনীব্যক্তিরা আরও সুরক্ষিত হয় যা ইংরেজ আমলে রায়বাহাদুররা করতেন।

গত কয়েকদিন পূর্বে এক প্রমুখ দেশের বরিষ্ঠ রাজদূতের সঙ্গে নিমন্ত্রণ পার্টিতে বসে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন— এই প্রথমবার ভারতের প্রতি দেখার বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ বদল হলো। এমন একদিন ছিল যখন 'পোখরান-২' বিস্ফোরণ ঘটানো হলো তখনও এটা সম্ভব ছিল না যে ভারত পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে কয়েক হাজার কিলো বোমা ফেলে আসবে, অবিশ্বাস্যও ছিল। কারণ সবাই মানতে যে ভারত এক ভীতু দেশ, যুদ্ধের পরেও সমঝোতা করেও চলতে চায়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিলাসী রাজনেতাদের দেশ।

দেশভক্তি হলো ভারতের ধর্ম। এখানে গুরু তেগবাহাদুর 'হিন্দু কী চাদর' বলেছেন, শিখদের বা পঞ্জাবের নয়। তামিলনাড়ুতে শিবাজীর নামে নিজেদের নাম রাখে। বিবেকানন্দ যখন ধর্মের কথা বলেন তখন প্রতি বাক্যে ভারতের কথাই উঠে আসে। লোকে গর্বের সঙ্গে নিজের ছেলের নাম ভারত রাখে। এসব অন্য কোনো দেশে হয় না।

বর্তমানে দেশভক্তি গণতন্ত্রে উৎসব পালনের মুখ্য বিন্দুতে এসে গেছে— এটা শুভ। এই প্রথম দেশের বিভিন্ন দলের নেতারা নিজেকে প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত দেশভক্ত বলার চেষ্টা করছে। জয় হো। ❙

পরমাণু গবেষণার পথিকৃৎ ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

আমাদের দেশ আজ পরমাণু শক্তিতে শুধু যথেষ্ট সমৃদ্ধই নয়, এই মহাশক্তিকে মানব কল্যাণে নিযুক্ত করতে অগ্রণী দেশ সমূহের মধ্যেও অন্যতম। ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীরা এই কৃতিত্বের জন্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেন পরমাণু গবেষণার পথিকৃৎ ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার নাম।

তাঁর জন্ম ১৯০৯ সালের ৩০ অক্টোবর মুম্বইয়ের উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন এক ধনী পরিবারে। বাবা জাহাঙ্গীর ভাবা লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে টাটা কোম্পানির আইনি বিশেষজ্ঞ ও টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার বোর্ড অব ডাইরেক্টরে সদস্য ছিলেন। মা মেহেরবাঈও ছিলেন অভিজাত বংশীয়া। তাঁর ঠাকুরদা ড. হরমোজি জে ভাবা ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ ও মহীশূরের শিক্ষা অধিকর্তা। ভাবার ছেলেবেলা কাটে মুম্বই শহরে। পড়তেন ক্যাথিড্রাল স্কুলে। পরে জন ক্যানন স্কুলে। ছেলেবেলায় ভাবার সংগীত অনুবাগ, সাহিত্যপ্রীতি সবাইকে মুগ্ধ করত। ঠাকুরদা তাঁর আচার-আচরণ লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এ ছেলে একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

ভাবা কেমব্রিজ থেকে যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে এলফিনস্টোন কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হন। পরে রয়েল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে প্রথমবর্ষ বিএসসি পড়ে মাত্র আঠেরো বছর বয়সে পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। সেখানে মেকানিক্যাল সাইন্সেস ট্রাইপস হন। ভাবা কিন্তু দেশে ফিরলেন না। পদার্থবিদ্যার প্রতি তীব্র অনুরাগ থাকায় বাবাকে চিঠি লিখলেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরি তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চান। বাবার অনুমতি পেয়ে ডুবে গেলেন পদার্থ বিজ্ঞানে। সেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাহচর্য পেলেন। গণিতে

ট্রাইপস হয়ে লাভ করলেন রাউজ বল ট্রাভেলিং স্টুডেন্টশিপ। সেখানে থেকে কেপেনহেগেন। সেখানেও বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাহচর্য লাভ করে প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। পুরস্কার স্বরূপ পেলেন আইজ্যাক নিউটন স্কলারশিপ। এরপর গেলেন ইতালি। সেখানে এরনিকো ফের্মির অধীনে গভীর ভাবে গবেষণায় মগ্ন হলেন।

কেমব্রিজে পড়ার সময় মানুষের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা তাঁর মনে বেদনা দিত। তাই তিনি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণাকে বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণে কাজে লাগাতে উৎসাহিত হলেন। সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তিনি দীর্ঘ বারো বছর পর দেশে ফিরে এলেন। এই সময় মা তাঁকে ধরলেন বিয়ে করে সংসারী হতে। কিন্তু ভাবা সবিনয়ে মায়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন তাঁর লক্ষ্য বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন থেকে দেশকে বড়ো করা, বিয়ে করে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ইচ্ছে নেই।

তিনি যোগ দিলেন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়াল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে। সেখানে কর্ণধার তখন সিভি রমণ। তিনি সি এস মাধবরাও ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে গবেষণায় মগ্ন হলেন। পরমাণু শক্তি গবেষণার পরিকাঠামোগত অভাব অনুভব করে তিনি জামসেদজী টাটাকে চিঠি লিখলেন। জামসেদজী সেই চিঠির উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দিয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য উদ্যোগ নিলেন। ভাবার স্বপ্ন সার্থক হলো। গড়ে উঠল টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। ভাবা তার ডাইরেক্টর নির্বাচিত হলেন। এরপর সেন্ট্রাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট অব রিসার্চের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৮ সালে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন।

পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে পরিচালক হিসেবে ড. ভাবার নেতৃত্বে দেশের বিজ্ঞনীদের সাহায্যে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর 'অপ্সরা', কানাডা-ভারত যৌথ উদ্যোগে থোরিয়ম প্লান্ট, ইউরেনিয়াম মেটাল প্লান্ট ছাড়াও সম্পূর্ণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ফুয়েল এলিমেন্ট ফেব্রিকেশন ফেসিলিটি, হেভিওয়াটার রিকন্সট্রাকসন, হেভি ওয়াটার প্লান্ট ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে তিনি দেশকে আণবিক যুগে উন্নীত করলেন।

১৯৬৬ সালে ২৪ জানুয়ারি এই মহান বিজ্ঞানীর রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনায় জীবনাবসান হয়।

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

ভারতের পথে পথে

রামটেক

মহারাষ্ট্রে প্রদেশের নাগপুরের ৪২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সবুজে ঘেরা টিলা, নানান সরোবর,দুর্গ ও প্রাচীন মন্দির নিয়ে ঐতিহাসিক শহর রামটেক। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই টিলায় দাঁড়িয়েই রাক্ষস নিধনের সংকল্প করেছিলেন। অতীতে এর নাম ছিল তপোগিরি। স্থানীয় লোকেরা একে গড়মন্দিরও বলে থাকে। অগস্ত্য, শম্বুক মুনির স্মৃতিধন্য এই শহর। রামটেকের নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে মহাকবি কালিদাস এখানে মেঘদূতম্ রচনা করেন। সেই স্মারক এখানে রয়েছে। ঢালের নীচে সরোবরের তীরে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের বাকাতক রাজাদের দুর্গ রয়েছে। পাহাড়ের উপরে রয়েছে ব্রাহ্মণিক্যাল ধাঁচের ২৭টি মন্দিরের পরিসর। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের তিনটি মন্দির, অগস্ত্য আশ্রম, অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত দৈন মন্দির, কালীমন্দির। নভেম্বর মাসের শেষে এক পক্ষকাল মেলা বসে। রামটেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) জন্মগ্রহণ করেন।

জানো কি?

ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধ্যেয়বাক্য

- CBSE— অসতো মা সদ্গময়।
- DRDO— বলস্য মূলম্ বিজ্ঞানম্।
- IIM কলকাতা— জ্ঞানম্ সর্বহিতায়।
- AIIMS--- শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
- IIT ধানবাদ— উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
- BIT মেরসা— সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।

ভালো কথা

ঠাকুমার দুঃখ ও আনন্দ

যেদিন কাশ্মীরের পুলওয়ামায় আমাদের চল্লিশ জন জওয়ান জঙ্গি হানায় প্রাণ দিলেন, সেদিন সকালে খবরটা শোনার পর ঠাকুমার সেকি কান্না। আবার বিকেল হতেই খুব রেগে গিয়ে পাকিস্তানকে গালাগালি করতে শুরু করল। জেঠুকে বার বার জিজ্ঞাসা করছে এর কি কোনো ব্যবস্থা হবে না? যতবার ঠাকুমা জিজ্ঞেস করে ততবারই জেঠু বলে নিশ্চয় হবে। তারপর যেদিন আমাদের বিমানবাহিনী ওপারের জঙ্গি ঘাঁটির উপর বোমা মেরে সব গুঁড়িয়ে দিল, সেদিন খুব খুশি হয়ে জেঠুকে ধরে ঠাকুমা বলল তুই ঠিকই বলেছিলিস। আবার পরদিন যখন শুললো পাকিস্তানের একটি বিমানকে মেরে আমাদের পাইলট অভিনন্দন ধরা পড়েছে, তখন আবার কান্নাকাটি। সন্ধ্যায় আমাকে বলল আয় ঠাকুরঘরে বসে অভিনন্দনের জন্য প্রার্থনা করি। পরদিন রাতে অভিনন্দনের মুক্তি পাওয়ার খবরে ঠাকুমা পাড়ার সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছে।

বিদিশা রায়, একাদশ শ্রেণী, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

অভিনন্দন

অর্ণব সাহা, দ্বাদশ শ্রেণী, হিলি দক্ষিণপাড়া, দঃ দিনাজপুর।

ভারত নন্দন
শত শত বন্দন
অভিনন্দন।
ভারত সন্তান
শত শত প্রণাম
জয় জওয়ান।

উইং কম্যান্ডার
মানোনিকো হার
শত্রু ছারখার।
ভারত প্রাণ
ভারত সম্মান
অভিনন্দন বর্তমান।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১৫।।

একটি সময়োপযোগী গ্রন্থ

কোহানা রায়

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন, শ্রীনগরে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে বন্দি থাকাকালীন রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যক্তির দেওয়া সাক্ষ্যে এবং তথ্যপ্রমাণাদিতে এটি সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে যে, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুটি নিছক অসুস্থতাজনিত মৃত্যু ছিল না। বরং, এর পিছনে কোনও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রই কাজ করেছিল। ফলত এইরকম একটি প্রশ্ন বারেবারেই ঘুরে ফিরে এসেছে যে, রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের হাতেই কি শ্যামাপ্রসাদকে খুন হতে হয়েছিল? শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং জম্মু-কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা— শেখ আব্দুল্লার আচরণ নিয়েও বারেবারেই নানারকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও, দীর্ঘ ছ'দশক পেরিয়ে গেলেও শ্যামাপ্রসাদের এই মৃত্যু রহস্যের কোনও তদন্ত হয়নি। অনেক প্রশ্নই এখনও অমীমাংসিত এবং রহস্যাবৃতই রয়ে গিয়েছে।

কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের এই মৃত্যুবরণের একটি প্রেক্ষাপট রয়ে গিয়েছে। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পরই শেখ আব্দুল্লা এবং তার ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরের মাটিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ রোপণ করতে শুরু করেন। ভারতের ভিতর অবস্থান করলেও কাশ্মীরকে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের রূপ দেওয়াই ছিল শেখ আব্দুল্লার লক্ষ্য। কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র

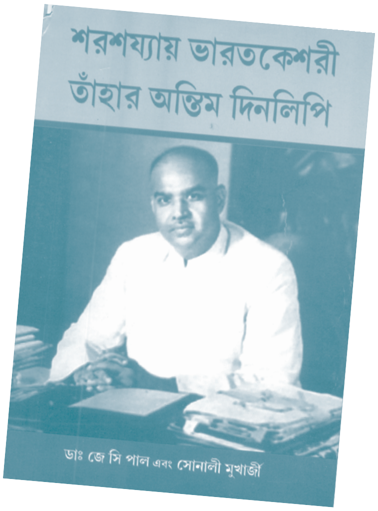

পতাকা, স্বতন্ত্র আইন এবং স্বতন্ত্র সংবিধান— এই ছিল আব্দুল্লার দাবি। আবদুল্লার এই অন্যায্য দাবি বস্তুত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মেনেও নিয়েছিলেন। আর জওহরলালের এই পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নিয়ে জম্মুতে

পুস্তক প্রসঙ্গ

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর নির্মম অত্যাচার নামিয়ে এনেছিলেন আব্দুল্লা। আব্দুল্লার এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি এবং নেহরুর অদূরদর্শিতা যে, ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করতে চাইছে— তা বুঝতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কাশ্মীরকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কাশ্মীর অভিযানে গিয়েছিলেন। এই কাশ্মীর যাত্রা করার সময়ই ১৯৫৩ সালে শেখ আব্দুল্লা সরকারের পুলিশ তাকে আটক করে। এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীনগরে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে তাঁর জীবনাবসান হয়।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলন এবং পরিণতিতে তাঁর অকাল প্রয়াণ— এই ঘটনাপ্রবাহের ওপর সম্প্রতি ডাঃ জে.সি. পাল এবং সোনালী মুখার্জি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির শিরোনাম 'শরশয্যায় ভারত কেশরী তাঁহার অন্তিম দিনলিপি।' বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশনা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে বুঝতে এবং তার উৎসমুখ কোথায় তা অনুসন্ধান করতে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। শেখ আব্দুল্লার রাজনীতি যে কাশ্মীরকে এক ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তার মাশুল যে সমগ্র দেশকেই দিতে হবে, তা সেই পঞ্চাশের দশকেই শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন। এবং সে ব্যাপারে বারবার তিনি সতর্ক করেছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে। ছ' দশক পরে আজ কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায়, কতটা দূরদর্শী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আর সেই সময় নেহরুর দূরদৃষ্টির অভাব কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ভারতকে।

গ্রন্থকারদ্বয় তাদের এই গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনা এবং তথ্যের সমাহারে ইতিহাসের ওই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের পত্রসমূহ। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ যে কতখানি আন্তরিক এবং আপোশহীন ছিলেন— এই পত্রসমূহই তার প্রমাণ। গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য। এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে গ্রন্থকারদ্বয় একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

শরশয্যায় ভারত কেশরী তাঁহার অন্তিম দিনলিপি— ডাঃ জে.সি. পাল এবং সোনালী মুখার্জি। তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।। দাম : ১৬০ টাকা।

অন্য রকম

চার দেওয়ালের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে মানুষের কল্যাণে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ তখন তার ষোলো বছর বয়েস। লখনৌ গিয়েছিলেন পড়াশোনা করবেন বলে। কয়েকদিন থাকার পর শহরটাকে তার বেশ ভালো লাগল। তখনও তিনি শহরের অলিগলির সঙ্গে পরিচিত নন। যেদিন পরিচয় হলো সেদিন থেকে তার ভালোবাসা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ল। তিনি লক্ষ্য করলেন স্টেশনের আশেপাশে অসংখ্য ভিখিরির বাস। ভিখিরিরা প্রায় সকলেই ড্রাগের নেশা করেন এবং রাতে একটি সুপরিচিত হোটেলের লাগোয়া ফুটপাথে ঘুমোন।

নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ সেই ষোলো বছরের কিশোর। যার নাম শারদ প্যাটেল। কষ্ট অনেক সময় মনের ইচ্ছেগুলো স্পষ্ট করে দেয়। সেদিন শারদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আজকের পরিণত শারদ স্মৃতিরোমন্থন করে বলেন, 'আমার মনে হয়েছিল ওদের সাহায্য করার জন্য কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে।' এগিয়ে যাওয়ার ভাবনার সেই শুরু। কিন্তু তারও তো একটা প্রস্তুতি চাই।

কলেজের পরীক্ষায় পাশ করার পর শারদ বাড়িতে জানিয়ে দিলেন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজসেবা নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। এও জানালেন, ভবিষ্যতে তিনি সমাজসেবাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ তাদের ছেলেমেয়েকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাবার কথা ভাবেন। সেখানে সমাজসেবা? নৈব নৈব চ! ভাগ্য ভালো শারদের দাদা ভাইয়ের পাশে ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় শারদ ফিরে গেলেন লখনৌতে। সেখানে কয়েকদিনের মধ্যে ঘটা একটা ঘটনা তার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তোলে। একদিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার পথে এক ভিখিরির সঙ্গে দেখা। অশক্ত মানুষটি শারদের কছে টাকা চাইলেন। টাকা না দিয়ে শারদ সেদিন তকে পেটভরে খাইয়েছিলেন।

কিন্তু কতজনকে তিনি খাওয়াতে পারেন? কতদিনই বা পারেন? শীঘ্রই শারদ বুঝলেন এভবে হবে না। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে ওই মানুষগুলোকে দক্ষ করে তোলা দরকার। তবেই কর্মসংস্থান সম্ভব। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে লখনৌ শহরে একটি আর্থ সামাজিক সমীক্ষা করলেন শরদ। জানা গেল, শহরে মোট ৩,৫০০ ভিখিরির বাস। ওদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষিত। মাধ্যমিক পাশও দু-একজন আছেন। কিন্তু যার ওপর ভিত্তি করে অর্থ রোজগার করা সম্ভব, সেরকম কোনও বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা এদের কারোরই নেই।

তা হলে? না, হতাশ হননি শারদ। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর তিনি 'ভিক্ষাবৃত্তি মুক্তি অভিমান' শুরু করেন। উদ্দেশ্য, ভিখিরিদের সমস্যা যতটা সম্ভব দূর করা এবং তদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। শহরের যেসব অঞ্চলে ভিখিরির সংখ্যা বেশি, কাজের শুরুতে সেইসব জায়গা বেছে নিয়েছিলেন শারদ। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় পরিত্যক্ত মানুষগুলোর বিশ্বাস অর্জন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। তদের সমাজের কেউ নন, এমন একজনকে প্রথম দিকে প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন ভিক্ষুকেরা। দমে যাননি শারদ। কিছুদিন মেলামেশার পর বুঝতে পেরেছিলেন দু'বেলা খাবার জোটানোই মানুষগুলোর প্রধান সমস্যা। রেশন কার্ড করানোর ওপর গুরুত্ব দিলেন শারদ। কিন্তু রেশন কার্ড হয় কী করে? কারোও কাছেই তো ঠিকনার কোনও প্রমাণপত্র নেই। কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ব্যবস্থা করলেন শারদ। রেশন কার্ড মিলল। চাল ডাল আটার একটা সমাধান হলো। শারদও অর্জন করলেন সেই দুর্লভবস্তু—বিশ্বাস!

কথায় বলে, অন্নচিন্তা চমৎকারা! সেই চিন্তার সুরাহা হলে মাথা তোলে বাসস্থানের প্রশ্ন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় খোলা ফুটপাথে পড়ে থাকা মানুষগুলের কাছে মাথার ওপর ছাদ সম্ভবত দিবাস্বপ্ন। কিন্তু সেই দিবাস্বপ্নও পূরণ হলো শারদের সৌজন্যে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চারশে জন বাড়ি পেলেন। রাস্তায় জন্মানো বাচ্চাদের কোনও স্কুল ছিল না। শারদ তারও ব্যবস্থা করেছেন। শারদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শতাধিক বাচ্চা এখন সুর করে পড়া মুখস্থ করে। ২০১৫ সালে শারদ তৈরি করেছেন তার এনজিও। নাম, বদলাও। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, বদল।

বাইশজন ভিখিরি এখনও পর্যন্ত ভিক্ষে করা ছেড়েছেন। তাদেরই একজন বিজয় বাহাদুর ভোলা। এখন রিকশা চালান। এমন একটা আনকোরা নতুন জীবন পেয়ে তিনি খুশি। রিকশার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, 'ছেলেবেলায় আমি এই শহরে হারিয়ে গিয়েছিলাম। ভিক্ষে করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। শারদভাই এই রিকশা কিনে দিয়ে আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছেন।'

তবে শুধু শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা নয়। বদলাওয়ের প্রত্যেক কর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং বদলে যাওয়া প্রত্যেক ভিক্ষুককের কাছে শারদ অন্য এক বার্তাও পৌঁছে দেন। মানুষের অজ্ঞতা এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে প্রকৃতির নাভিশ্বাস ওঠার বার্তা। কিছুদিন আগে লখনৌ শহর দেখেছে প্রায় নর্দমায় পরিণত হওয়া গোমতীর বুক থেকে কীভাবে শারদের সেনাবহিনী বর্জ পদার্থ তুলে নদীকে তার স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়ে দিয়েছে।

গোমতী ভারতীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নদী। সেই নদীকে জঞ্জালমুক্ত করে শারদ শুধু পরিবেশ বান্ধবের ভূমিকা পালন করেননি, পরম্পরাকেও রক্ষা করেছেন। এরপর আর যাইহোক, ইতিহাসের শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহে অন্তত কোনও ছেদ পড়বে না।

মমতা ব্যানার্জির প্রতিটি পদক্ষেপ স্বৈরাচারের পদধ্বনি

সুজাত রায়

১৯৮৬-র ২৫ ফেব্রুয়ারি। রাত তিনটে। ফিলিপিনসের ম্যালকানান প্রাসাদের বাইরে তখনও লক্ষ মানুষের ভিড়। মাঝে মাঝেই স্লোগান উঠছে—'মার্কোস তুমি প্রাসাদ ছাড়ো। জনতার হাতে ক্ষমতা তুলে দাও।' মাঝে মাঝে জনতার ভিড় আছড়ে পড়ছে প্রাসাদের সদর দরজায়। ঠিক যেমন সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বালুকাবেলায়। জনতার দাবিতে মুখর হয়ে উঠছে গোটা ফিলিপিনসের আকাশ বাতাস—'আর নয়, আর নয়, মার্কোস তোমর অত্যাচারের আজই শেষ দিন।'

প্রাসাদের অভ্যন্তরে তখনও জেগে সপারিষদ মার্কোস। ২০ বছরের পুরনো স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপ্রধান। ঘুম নেই পাশের ঘরেই তার স্ত্রী ইমেলদার চোখেও। তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন, তাঁর প্রিয়তম স্বামী ফার্দিনান্দ মার্কোজ টেলিফোনে কথা বলছেন, আমেরিকার রিপাবলিকান ল'-মেকার এবং মার্কিন সেনেটর পল ল্যাক্সিটের সঙ্গে–'আমার বন্ধু রেগনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনোও লক্ষণই নেই বলছেন?'

ওপার থেকে সম্ভবত 'না' শুনেই মার্কোস বলে উঠলেন—

'প্রেসিডেন্ট রেগন কি আমায় পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন?'

ল্যাক্সিটের জবাব ভেসে আসে—

—'প্রেসিডেন্ট এখন কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।'

—'আপনি কী বলেন সেনেটর? আমার কি পদত্যাগ করাই শ্রেয়?'

—'আমার মনে হয় সেটাই ভাল। চুপচাপ বেরিয়ে যান। সময় এসে গেছে।' ল্যাক্সিটের কণ্ঠে সহানুভুতি এবং কর্তৃত্ব–দুটিই সমানভাবে বিদ্যমান।

মার্কোস ফোন কাটলেন না। কানে ফোনটা চেপে ধরেই পাথরের মত স্থবির হয়ে রইলেন।

অস্থির ল্যাক্সিট—মি. মার্কোজ, আপনি কি এখনও ফোনে রয়েছেন?

মার্কোস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'আমি সত্যিই বড় হতাশ।'

ভিতরের ঘরে তখন নীরবে চোখের জল ফেলছেন ইমেলদা মার্কোস—সেই মহিলা যিনি জনগণের অর্থে টানা বিশবছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত লালসা, সমস্ত সুখ, সমস্ত কামনা আর বিলাসকে কিনে রেখেছিলেন নিজের দুহাতের মুঠোয় আর স্বেচ্ছাচারিতার নগ্ন চেহারাটা নিয়ে মাঝে মাঝেই ছুটে যেতেন চার্চে। প্রাসাদের অভ্যন্তরেই। প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করতেন—'জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দাও প্রভু।'

তবে স্বৈরাচারী লোকটা তো মার্কোস। সুখের দিন সমাগত প্রায়, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে প্রাসাদের প্রধান ফটক। যে-কোনো সময় ভেসে আসবে জনতার মাঝখান থেকে নতুন রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের উল্লাস, যে-কোনোও সময়েই আছড়ে পড়তে পারে হিমশীতল মৃত্যু জেনেও তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান শুরুর নির্দেশ দিলেন। কারণ যেভাবেই হোক ভোট লুণ্ঠন বা কৌশল করেও তিনিই ভোটে জিতেছেন। অতএব তিনিই শপথ নেবেন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসেবে। মঞ্চে প্রধান বিচারপতি রামোন অ্যাকুইনো যখন শপথবাক্য পড়াবেন বলে প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। কোথা থেকে ছুটে এল একটা গুলি আর নিমেষে

ছিটকে দিল ট্রান্সমিটারটিকে যেটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করছিল তিনটি টেলিভিশন নেটওয়ার্কে।

মার্কোস তাতেও দমলেন না। ব্যালকনি থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ালেন—ঘোষণা করলেন, তিনিই আবার রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ফিলিপিনসের।

কিন্তু সে তো কয়েক মুহূর্তের জন্যই। তারপরে সপরিবারে মার্কোসকে উঠতে হলো একটি মার্কিন হেলিকপ্টারে। কোথায় যেতে হবে নিজেও জানেন না।

এক ঘণ্টা পর হেলিকপ্টার মাটি ছুঁল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। এখানেই কেটেছিল তাঁর শেষ দিনগুলো। সম্পূর্ণ নির্বান্ধব, নিঃস্ব, পরামুখাপেক্ষী হয়ে যতক্ষণ না তিন বছর পর মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিল তাঁর স্বৈরাচারীর খোলসটিকে।

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। ভারত স্বাধীন হলো। বিভাজিত ভারত ভূখণ্ডের দিকে দিকে উড়ল তেরঙ্গা পতাকা। সেই সঙ্গে কালো পতাকাও, বিদ্রোহীদের যারা চেয়েছিলেন ভারত স্বাধীন হোক বিভাজন ছাড়াই। কিন্তু তিনি কোথাও নেই। তিনি অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী। দুদিন আগে তিনি তখন গভীর নির্জনতায় একাকী দিনযাপন করছেন বেলেঘাটার হায়দরি হাউসে। একটু

আগেই একদল জনতা ঘিরে ধরেছিল হায়দরি হাউস। স্লোগান উঠেছিল গান্ধী ফিরে যাও। তুমি আশ্রয় নাও সেই এলাকায় যেখান থেকে তোমার মদতে মুসলমানরা হিন্দুদের বিতাড়িত করেছে। ইটপাটকেল পড়েছে। জানালার কাঁচও ভেঙেছে দু-চারটি। সঙ্গী বলতে সেই সুরাবর্দি যিনি হিন্দুদের চক্ষুশূল। গান্ধীর চোখে ঘুম নেই। নিজেই বিড়বিড় করছেন, 'আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে মূল্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, সেই স্বাধীনতা ভবিষ্যতে আরও অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আমি হয়তো সেদিন বেঁচে থাকবো না। তবু আগামী প্রজন্ম জানুক, আমি, গান্ধীজী, জাতির জনক, এই বৃদ্ধ বয়সে কী যন্ত্রণা সহ্য করছি।' গান্ধীজী ছটপট করছেন এক অকপট যন্ত্রণায়, আর কামনা করছেন, 'মৃত্যু আসুক..... মৃত্যু আসুক। যত ভুল, যত অন্যায়, যত পাপ, সব ধুয়ে মুছে যাক। শেষ হোক এই জীবনের খেলা আর রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। হে রাম, ক্ষমা করো আমায়।'

বিশ্বের দুটি বিখ্যাত মানুষের জীবনের দুটি খণ্ডচিত্র। মার্কোস ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই স্বৈরাচারী। আর মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সাদা পায়রার ডানাওয়ালা এক রাজনীতিবিদ যিনি মুখে জপতেন গণতন্ত্রের মন্ত্র আর বুকের ভিতরে পোষণ করতেন স্বৈরতন্ত্রের ধ্বজা। দুজনেই পৃথিবী ছেড়ে গেছেন বহুদিন আগেই।

কিন্তু স্বৈরাচারিতা মুছে যায়নি। বরং বিশ্বের বহুপ্রান্তে নতুন চেহারায়, নতুন মুখোশে আবির্ভাব ঘটছে নয়া স্বৈরাচারী রাজনীতিবিদের। তাঁদের একজন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

না, তিনি মার্কোসের মত বিলাসী নন। উত্তর কোরিয়ার কিম-এর মত অত্যাচারী নরপিশাচও নন। বরং তিনি দাম যতই হোক না কেন হাওয়াই চটি পরেন, দাম যতই হোক না কেন সুতির শাড়ি পরেন। খরচ যাই হোক না কেন অত্যন্ত প্রিয় ভাইদের স্বার্থে তিনি অকাতরে জনগণের অর্থ বিতরণ করেন। বিষমদ খেয়ে কেউ মরে গেলে তার পরিবার দু' লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পান এবং দুর্গাপুজোর নামে যে-কোনও পুজো সংগঠকই দশ হাজার টাকা অনুদান পান 'না চাইতেই পানি'র মতো। তিনি কন্যাশ্রী প্রকল্পে স্কুলের ছাত্রীদের বছরে ২৫ হাজার টাকা, একটা সাইকেল দেন। রূপশ্রী প্রকল্পে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেন। এমনকী ইমামদের দুঃখে কাতর মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ইমামকে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে ভাতা দেন। যদিও তা পুরোহিতদের দেন না। তাহলে তাঁকে স্বৈরাচারী বলা হবে কোন দুঃখে?

খুব ন্যায্য প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরটাও এককথায় ন্যায্য। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও গান্ধীর মতই মূর্তিমান এক স্বৈরাচারী যিনি গত সাত বছরে তাঁর লুকিয়ে থাকা স্বৈরাচারী চরিত্রটিকে আর চেপে রাখতে না পেরে প্রকাশ্যে এনে ফেলেছেন এবং ধরেই নিয়েছেন, মানুষ এখনও তাঁকে ঘরের মেয়ে সততার প্রতিমূর্তি হিসেবেই পুজো করেন।

তাঁর স্বৈরাচারিতার লক্ষণগুলি কী কী?

আসুন এবার একটু মনোবিদদের সাহায্য নেওয়া যাক। মনোবিদরা বলছেন, একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, একনায়ক বা নায়িকা ব্যাক্তিত্ববান হন, আত্মবিশ্বাসী হন, স্বাধীনচেতা হন আর তিনি খুব ভালোভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে জানেন। সেই সঙ্গে রয়েছে যে দুটি প্রধান লক্ষণ তা হলো ঃ তিনি প্রতিশোধপরায়ণ ও সর্বদাই যে-কোনও কাছের মানুষকেও দূরে ঠেলে ফেলতে পারেন। ফলে প্রকৃত অর্থে তাঁর কোনো বন্ধু থাকে না। যাঁরা তাঁকে ঘিরে থাকেন তাঁরা সুখের দিনের পায়রা। বিপদের দিনে ডানা ঝাপটে উড়ে পালান।

এবার ওই বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিয়ে নিন পশ্চিমবঙ্গের দিদি তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি ব্যক্তিত্ববান। সেই ১৯৮৪ সালে বামপন্থী ব্যাক্তিত্ব সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে জীবনে প্রথমবার সংসদ সদস্য হওয়ার আগে থেকেই রাজ্যের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল তার নাম—একাধারে লড়াকু যুবনেত্রী, অন্যদিকে ঘরের মেয়ের ইমেজ নিয়ে। তারপরের ৪২ বছরের মধ্যে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন নিজের মতো করে। আত্মবিশ্বাসী তো বটেই। ভুল করলে, অন্যায় করলেও আত্মবিশ্বাস হারান না। স্বাধীনচেতা বরাবরই। কালীঘাটের বস্তি থেকে উঠে আসা মেয়েটা স্বাধীনচিত্ত নিয়েই যেমন কাজ করেছেন দুধের ডিপোয়, তেমনি আবার হয়েছেন ভারতের রেলমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের সঙ্গে মেলামেশাটা তাঁর সহজাত। পিছনে উদ্দেশ্য অবশ্যই রাজনীতি। একবার এক দৈনিকের বিখ্যাত সম্পাদক বলেছিলেন, নেতাজীর পর মমতার মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গে জন্মাননি। একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও এই মতামতকে উপেক্ষা করা যাবে না। এ পর্যন্ত মোটামুটি সব ঠিকঠাকই আছে। সমস্যা হলো পরবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই যেখানে মনোবিদরা বলছেন, স্বৈরাচারীরা হন প্রতিশোধ পরায়ণ এবং যে-কোন মানুষকে যে কোনো সময় ঠেলে সরিয়ে দিতে পারেন। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো স্বৈরাচারিতার এই লক্ষণগুলিও মমতার মধ্যে কী প্রবলভাবে বিদ্যমান তা গত ৭/৮ বৎসরের নানা ঘটনাবলীতে স্পষ্টতই পরিস্ফুট।

১৯১১ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর দল পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বের অবসান হয়েছিল। নতুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বদলা নয়, বদল চাই। কিন্তু আদপে হয়েছে কি? গোটা রাজ্য জ্বলেছে, জ্বলছে আজও প্রতিহিংসার আগুনে। মাঝে মাঝে মুখে স্বীকারও করে নিচ্ছেন যে প্রতিশোধের আগুনে তাঁর বুক জ্বলে যায়। তাই ঘর জ্বলেছে বামপন্থীদের। ঘরছাড়া, পাড়াছাড়া হয়েছেন শত শত বামকর্মী। বামকর্মীদের সন্তানদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘরের মেয়ে বৌদের। পরিণতি কী হয়েছে তা লেখার অপেক্ষা রাখে না। আজও হচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের ওপর। কঠোর স্বৈরাচারীর মতোই তাঁরই গোপন নির্দেশে বিরোধী শক্তিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে সর্বত্র। বিরোধী রাজনৈতিক শিবির মুখ খুললেই বিপদ। গ্রামে গ্রামে শুরু

হয়ে যাবে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে রাজনৈতিক আক্রমণ। যেখানে সেখানে যখন তখন।

আর ঘনিষ্ঠজনদের ঠেলে ফেলার নজির তো অফুরন্ত। তারই একনিষ্ঠ সহকর্মী মদন মিত্র, তাপস পালরা চিটফান্ড কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। তাঁদের দিদি একবারও খোঁজ নেননি। কুণাল ঘোষের কলম ধরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আবার নিজেই তাঁকে জেলে ভরেছেন। আর যাঁর কৃপায় তিনি নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় ঘটিয়েছেন, সিঙ্গুরে তেভাগা আন্দোলন গড়েছেন, সেই মাওবাদী নেতা কিষেনজীকে গুলি করে হত্যা করে সরিয়ে দিতে তাঁর হাত এতটুকুও কাঁপেনি। এবং সবচেয়ে যন্ত্রণার যা তা হলো কিষেনজীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছিলেন কিষেনজীরই ঘনিষ্ঠ নেত্রী সুচিত্রা মাহাতোকে যিনি আজও প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত থাকেন রাজ্য পুলিসের বুলেটে বুক পেতে নেবার জন্য। কারণ একমাত্র তিনিই কিষেনজী হত্যার নেপথ্য কাহিনির সাক্ষী। সাক্ষীর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিক্সনারিতে।

ফলত, তিনি যতই মনে করুন না কেন, বাংলার তিনি রাজরাজেশ্বরী, তিনি যতই মনে করুন না কেন, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফলের সুগান গেয়ে তিনি নিজেকে বঙ্গমাতার বঙ্গজননীর আসনে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন, আসলে তিনি প্রতিদিন কিছু হারিয়েছেন। প্রতিদিন মানুষের মনের আনাচকানাচ থেকে তিনি সরে যাচ্ছেন। একজন অতিলোভী, অতিরিক্ত প্রত্যাশাবাদী রাজনীতিবিদ যিনি নিজের যোগ্যতা এবং প্রতিভা সম্বন্ধে নিজেই সম্যকভাবে অবহিত নন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব ও মানবিক আচরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক জেমস ফ্যালেন বলেছেন—''Power, Fear and Anxiety'' সব সময় স্বৈরাচারীদের ঘিরে থাকে। ''They see themselves as very special deserving admiration. They are vindictive and posses personality disorder।'' অধ্যাপক ফ্যালেন আরও বলছেন—এঁরা (স্বৈরাচারীরা) যা নন, তাই হতে চান। সমস্যা সেখানেই নিজেদের অযোগ্যতা নিয়ে এঁরা Inferiority complex-এ ভোগেন। তাই সরকারের পূর্ণ অধিকার নিজের হাতেই রাখতে চান।

পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ—একটু মিলিয়ে নিন। দেখবেন, অধ্যাপক ফ্যালেনের প্রতিটি পর্যবেক্ষণ কী অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতা ও আচরণের সঙ্গে। তিনি যে Inferiority Complex-এ ভোগেন, তার প্রমাণের অভাব নেই। নিজেকে পণ্ডিত মনে করলেও তিনি যে সাধারণ ইতিহাস সম্পর্কেই অজ্ঞ তার প্রমাণ তিনি বারে বারে রেখেছেন। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারেন—১৯৪৬ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীকে লেবুর রস খাইয়ে অনশন ভাঙিয়েছিলেন। অজ্ঞতা এতটাই যে জানেন না ১৯৪১-এই দেহান্তরিত হয়েছিলেন বিশ্বকবি। সেদিনটা ছিল বাংলামতে ২২শে শ্রাবণ। তাই প্রকাশ্য জনসভায় সাওঁতাল বিপ্লবের নায়ক সিধো কানহকে স্মরণ করতে গিয়ে ডহর বাবুর পরিবারকেও খোঁজেন। জানেন না—ডহর মানে বাগান। অথচ তিনি নাকি 'জঙ্গলমহলের মা'। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি অতি আত্মবিশ্বাসে ভোগেন। একবারও বুঝতে পারেন না ২০১১ সালে তিনি নেতিবাচক ভোটে জিতেছিলেন। ইতিবাচক ভোটে নয়। কারণ মানুষের সামনে আর কোনও রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার চেয়ারে বসে যখন বুঝলেন, ব্যাপারটা বীজগণিতের ফর্মূলা নয়, তখন থেকেই ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সন্দিহান হয়ে পড়লেন। এক ভয়াবহ উদ্বেগ থেকেই তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নের মুখে জবাব দিতে না পেরে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে মঞ্চ ছাড়লেন। কামদুনীতে দুই গ্রাম্য প্রতিবাদী মহিলাকে মাওবাদী বলে প্রকাশ্যে অপমান করলেন। মেদিনীপুরে এক অতি সাধারণ গ্রামীণ যুবকের প্রশ্নের জবাব দিতে না পরে তাকে মাওবাদী বলে জেলে ভরলেন। যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে জেলে ভরলেন সামান্য একটি কার্টুন আঁকার জন্য। সবটাই নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসের অভাব অথবা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে প্রসূত উদ্বেগের ফল। ফলে সুযোগ পেলেই তিনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং ব্যক্তিত্বের অপমান করেন নিজেই। Personality disorder-এর চরম উদাহরণ চিটফান্ড কাণ্ডে অভিযুক্ত কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে বাঁচানোর নামে নিজেকে বাঁচানোর হাস্যকর ধরনা। যে জনগণ এত ঘটনা সত্ত্বেও মনে করতেন, মমতা অন্তত সৎ, তাঁরাও বুঝে গেল এই ধরনা ধরনা খেলার মানে। মহাত্মা গান্ধীরও এই একই Personality Disorder ছিল। বহু সময়ে শুধু নিজেকে জাহির করার জন্য অযৌক্তিক এবং দুর্বিনীত স্বভাবের পরিচয় তুলে ধরতেন কথায় কথায় ধরনা এবং অনশন করে। তাঁর ফলাফল হয়েছিল, স্বাধীনতার প্রথম মুহূর্তে তাঁকে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চের থেকে সরে যেতে হয়েছিল। আসলে একই রাজনৈতিক খেলা সব সময় Game Changer হতে পারে না—এটা গান্ধীজীও ভুলে গিয়েছিলেন। আর নিজেকে গান্ধীর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়েও জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ভুলই করে চলেছেন। বুঝতেই পারছেন না—রাজনীতির খেলাটা হচ্ছে অন্যত্র, তাঁর নেপথ্যে। খেলছেন তাঁর সঙ্গীরাই যাঁরা তাঁকে সামনে রেখে দুর্নীতির রেকর্ড ভাঙছেন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এবং গড়ে তুলছেন একটি ফ্রাঙ্কোস্টাইন বাহিনী যারা উদ্যত ছুরি নিয়ে একদিন মুখোমুখি হবে তাঁর এবং সেদিন তিনি বড়জোর বলতে সময় পাবেন—ব্রুটাস, তুমিও। হ্যাঁ ব্রুটাসই—সবাই। তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, পুলিশকর্তা, প্রশাসনিক কর্তা মায় পরিবারের মানুষগুলোও সেদিন চরম প্রতিরোধের মুখে পড়বেন, সেদিন তাঁদের 'ব্রুটাস' চরিত্রগুলি জনগণ প্রকাশ্যে দেখতে পাবেন। আর দেখতে পাবেন—শেক্সপিয়ারের ট্রাজিক হিরোর মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মানুষ কীভাবে রাতারাতি স্মৃতির মণিকোঠা থেকে মুছে ফেলছেন। *(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)*

রাজ্য রাজনীতি

মোদী বিরোধিতায় তৃণমূল সাংসদরা সংসদে নীরব ছিলেন কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতবর্ষের সংবিধানে সংসদ সদস্যদের মূলত তিন ধরনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দায়িত্ব হল তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ। দ্বিতীয় দায়িত্ব হল, সংসদ সদস্য হিসাবে সংসদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা, বিভিন্ন বিতর্কে অংশ নেওয়া এবং তার মাধ্যমে প্রশাসনের দুর্নীতি, ব্যর্থতা ও অপকর্মগুলির সমালোচনা করা। তৃতীয় দায়িত্ব হল, তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই দলের সদস্য হিসেবে কর্তব্য পালন করা। সাধারণভাবে প্রতিটি সংসদ সদস্যেরই উচিত ন্যূনতম এই দায়িত্বগুলি পালন করা এবং প্রয়োজনে তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটার ও নাগরিকবৃন্দ এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দেশের জনগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কারণ প্রতিটি সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হন বেশ কিছু প্রতিশ্রুতির পশরা নিয়ে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি পালন না করলে জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়াটাও প্রত্যেক সংসদ সদস্যের কর্তব্য।

গত পাঁচ বছর ধরে, যেদিন থেকে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী প্রধানমন্ত্রী পদের মুখ হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে পা রেখেছেন। সেদিন থেকেই দেখা গেছে প্রতিবাদে সোচ্চার একজনই, তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪-র প্রাক নির্বাচনী সময় থেকে ২০১৯-এর নির্বাচনী সময় পর্যন্ত সম্ভবত একটি দিনও বাদ যায়নি যেদিন তিনি মোদীজীর বাপান্ত না করে জলস্পর্শ করেছেন। মোদীজী হলেন মমতার জাতশত্রু। যদিও মমতাকে শত্রুর মর্যাদা দিতেও একেবারেই রাজি নন মোদীজী, তা তাঁর গত পাঁচ বছরের আচরণেই স্পষ্ট।

অভিযোগ অঢেল। মোদী দাঙ্গাবাজ। মোদী সাম্প্রদায়িক। মোদী দেশদ্রোহী। মোদী ভারত বিভাজনের চেষ্টায় রত। মোদী দুর্নীতিবাজ। তিনি আদানী-আম্বানীদের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করেন। মোদী চোর। রাফাল বিমান কেনায় তিনি আর্থিক দুর্নীতি করেছেন। মোদী যুদ্ধবাজ। ভোটের স্বার্থে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির তুলেছেন। মোদী ড্রাকুলা। তাঁর অপদার্থতার জন্যই পুলওয়ামায় ৪০ জন জওয়ানের প্রাণ গেছে। সেনার রক্ত ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। মোদীর গাফিলতিতেই ব্যাঙ্ক প্রতারণা করে বিদেশ পালিয়েছেন বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীরা। তিনি জনবিরোধী। তার প্রমাণ নোটবন্দী। তার প্রমাণ জিএসটি চালু করা। মোদীজী মিথ্যাবাদী। কারণ তিনি বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করতে পারেননি। মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাথাপিছু ১৫ লক্ষ টাকা জমা পড়েনি। মোদী আন্তর্জাতিক অপরাধী। কারণ, পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সত্যতা প্রমাণে মোদী ব্যর্থ এবং মোদীজীর হাঁটাচলা, কথাবার্তা সবকিছুই শোলে সিনেমার ডাকাত-সর্দার গব্বর সিংয়ের মতো। মানুষ তাঁকে ভয় পায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদীজীকে নিত্যনতুন উপমা এবং উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গোটা ভারতবর্ষেই একটা বার্তা ছড়িয়ে দেন, মোদী বিরোধিতায় তিনি এককাট্টা এবং একমেবদ্বিতীয়ম্। কারণটা সহজেই অনুমেয়। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন এবং বিশ্বাস করেন, নরেন্দ্র মোদী অটলবিহারী বাজপেয়ী নন, যিনি মমতাজীর টালির চালের ঘরে পা রেখে তাঁর মা (এখন প্রয়াত)-কে প্রণাম করবেন না। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, হাজার চেষ্টা করেও চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারির অভিযোগ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের এবং দলকে রেহাই দেননি মোদীজী। তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারে একজনই— তিনি নরেন্দ্র দামোদার দাস মোদী।

সে না হয় হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব অভিযোগ না হয় রাজনৈতিক প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে মেনেও নেওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, পার্লামেন্টে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সদস্যদের ৯০ শতাংশই এই টানা পাঁচ বছর ধরে মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন? সৌগত রায়ের মতো দু-একজন সদস্য ছাড়া বাকিরা কোনও প্রসঙ্গেই মোদীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার হলেন না কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব। তার আগে সেই উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য কতকগুলি তথ্যের উপর নজর দেওয়া যাক। সংসদ সদস্যদের সংসদের বাইরে কোন ভূমিকায় দেখা গেছে? তা বিচার করবেন জনগণই। কারণ তাঁরা নিজেরাই দেখেছেন, খোলা মঞ্চে ঝিঙ্কুমণিদের সঙ্গে সংসদ সদস্যদের কাউকে কাউকে কোমর দোলাতে। কেউ বা মাসের পর মাস জেলবন্দী থেকেছেন। কেউ বন্দী অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় দিন গুজরান করেছেন। কেউ বা দিবালোকে নারদার অর্থ হস্তগত করেছেন, মানুষ তাও দেখেছেন।

আমাদের বিবেচ্য— সংসদের অভ্যন্তরে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের ভূমিকা কেমন ছিল?

সংসদে প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকা সংসদ অধিবেশন চলাকালীন প্রতিদিন লিপিবদ্ধ হয়। এই তালিকায় থাকে, সদস্য সংসদ অধিবেশনের কত শতাংশ সময় উপস্থিত ছিলেন। আবশ্যিক দায়িত্ব হিসাবে কটা প্রশ্ন

করেছেন। ক'টা বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। সেগুলির বিষয় কি ছিল। বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁরা কতটা দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সরকারি হিসেবে একটু চোখ বোলানো যাক। ২০১৪-তে যাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের হিসাবটা আগে দেখা যাক। চিত্রতারকা দেব (দীপক অধিকারী) পাঁচ বছরে সংসদে উপস্থিত থেকেছেন মাত্র ১১ শতাংশ অধিবেশনে। মাত্র দুটি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। সাকুল্যে তিনটি প্রশ্ন করেছেন তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র বা অন্য বিষয়ে। মুনমুন সেন (শ্রীমতী দেববর্মা)— সংসদে হাজির ছিলেন ৬৯ শতাংশ অধিবেশনে। কিন্তু মাত্র একটি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। প্রশ্ন? না, একটাও করেননি। বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র তারকা সন্ধ্যা রায়। ৭৭ বছর বয়স। প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তবুও ৫৩ শতাংশ অধিবেশনে হাজির ছিলেন। তিনটি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। না, উনিও একটা প্রশ্নও করেননি গত পাঁচ বছরে। রূপালী পর্দার আর এক তুখোড় নায়িকা শতাব্দী রায়। হাজিরা দিয়েছেন ৭৪ শতাংশ অধিবেশনে। চারটি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন? হ্যাঁ, মাত্র দুটি। কাঁথির রাজনৈতিক জমিদারী যাঁর হাতে সেই শিশির অধিকারী (যাঁর কৃপায় নন্দীগ্রামে আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল) ৪৬ শতাংশ হাজিরা দিয়েছেন, কিন্তু একটা বিতর্কেও অংশ নেননি। ওই জমিদারের কনিষ্ঠ তনয় দিব্যেন্দু অধিকারী বাবার চেয়ে দুই শতাংশ হাজিরায় এগিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু বিতর্কে অংশগ্রহণ? নৈব নৈব চ।

আরও আছে। শুনুন, মমতাবালা ঠাকুর, যাঁকে ঘিরে মতুয়া সম্প্রদায়ের কোন্দল তুঙ্গে, তিনি হাজির থেকেছেন ৭৩ শতাংশ অধিবেশনে। কিন্তু প্রশ্ন? না, না। ওসবের ধারও মাড়াননি তিনি। তবে কোনওরকমে দুটি বিতর্কে দু-চার কথা বলেছেন। দশরথ তিরকে হাজির থেকেছেন ৬৭ শতাংশ অধিবেশনে। প্রশ্ন করেননি কখনও। বিজয়চন্দ্র বর্মন হাজিরা দিয়েছেন ৫৩ শতাংশ অধিবেশনে। প্রশ্ন করেননি কখনও। ব্যতিক্রম দু-চারজন। যেমন

'২০১৯ বিজেপি ফিনিশ' শ্লোগানটি কেবল শ্লোগান হয়েই ঝুলবে কালীঘাটের গলিতে। কারণ শান্তি পেতে গেলে মমতাকে বাঁচতে হবে ওই শ্লোগানটুকুকে আঁকড়েই ২০২১-এ সব ভ্যানিশ হওয়ার আগেই।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা সৌগত রায়। এঁরাই বেশিরভাগ বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন অনেক। সেরা সৌগত রায়ই। ৯০ শতাংশ হাজিরা। ২২৭টি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। আর প্রশ্ন করেছেন ৫৭৩টি। দেখা যাচ্ছে, মোদীর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় অভিযোগগুলি নিয়ে একমাত্র তিনিই নাড়াচাড়া করেছেন। চিত্রতারকা তাপস পাল, যিনি সিপিএম ক্যাডারদের বাড়ি বাড়ি তৃণমূল কর্মী ঢুকিয়ে পরিবারের সদস্যাদের ধর্ষণের হুমকি দিয়েছিলেন তিনিও মোদীর বিরুদ্ধে একটিও প্রশ্ন করেননি। ৪৭ শতাংশ অধিবেশনে হাজির থেকে প্রশ্ন করেছেন মোট সাতটি— সবই অন্য বিষয়ে। বেশিরভাগ তৃণমূল সংসদ সদস্যের একই হাল। রহস্যটা এখানেই— প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরার সবচেয়ে বড় প্লাটফর্মকে তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ সদস্যরা ব্যবহার করেননি কেন? কার নির্দেশে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন? শুধুই জনগণের অর্থের অপচয় করেছেন। কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দুর্নীতির চেয়ার থেকে হঠাতে সংসদ ভবনকে ব্যবহার করেননি তাঁরা আর কেনই বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় বসে শুধু চীৎকার করে গেছেন মোদীর বিরুদ্ধে?

সাংসদদের এই হিসাবই প্রমাণ করে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাবাজী শুধুই রাজনৈতিক নাটক। যদি সত্যিই অভিযোগ থাকতো তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশেই দলীয় প্রতিনিধিরা সংসদে বিতর্কে অংশ নিয়ে দলে দলে রেকর্ড রাখার চেষ্টা করতেন। তা তিনি করতে দেননি। তারও একটা কারণ সহজেই অনুমেয়। মোদীর বিরুদ্ধে চিৎকার করে তিনি শুধু মোদীজীর বিরুদ্ধে আক্রমণের রাজনীতি করেছেন। কারণ চিটফাণ্ড কাণ্ডে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনরকমেই রেহাই দিতে রাজি হননি। মমতার হাজার অনুরোধ দূরে ঠেলে দেন নির্দ্বিধায়।

কিন্তু মমতা বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি বিজেপি বিরোধী নন। কারণ তিনি জানেন হয়তো ২০১৯ সালের নির্বাচনেই বিজেপির হাত ধরতে হবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। জোট রাজনীতির কাছে তো দিল্লি এখনও দূর অস্ত।

যাঁরা ভাবেন, মমতা পাগল, মমতার রাজনৈতিক বুদ্ধি কাঁচা, তাঁরা একটু তলিয়ে দেখবেন। বুঝতে পারবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিটি রাজনীতি পরিকল্পিত অঙ্কের ফর্মূলা মেনে। তিনি জানেন, কোন বিষয়ে দল সাংসদ কী ভূমিকা নিলে তা সাধারণ মানুষ কোনওদিনই তলিয়ে দেখেন না। তিনি জানেন, হাজারবার চীৎকার করে একটি জ্বলজ্যান্ত মিথ্যাকে মানুষের মনে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়।

কিন্তু সমস্যা হল, তিনি এটা জানেন না, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ সম্পাদন সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্তরে সাফল্য মিললেও দূরাগত দিনে তা ধরা পড়বেই। তারপর আর রাজনীতির জগতে তাঁর কোনও কদর থাকবে না।

২০১৯ সালের নির্বাচন হল সেই নির্বাচন যেখানে এই সব চালাকি ধরে ফেলার নির্বাচন। ২০১৯-এর নির্বাচন হল সেই নির্বাচন যেখানে মানুষ জবাবদিহি করবে প্রার্থীদের। উত্তর না পেলে গলাটা নামিয়ে দেবে প্রার্থী তালিকা থেকে। '২০১৯ বিজেপি ফিনিশ' শ্লোগানটি কেবল শ্লোগান হয়েই ঝুলবে কালীঘাটের গলিতে। কারণ শান্তি পেতে গেলে মমতাকে বাঁচতে হবে ওই শ্লোগানটুকুকে আঁকড়েই ২০২১-এ সব ভ্যানিশ হওয়ার আগেই। ■

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবাধ ধর্মান্তরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজ হিন্দু, কাল মুসলমান! আজ খ্রিস্টান, কাল মুসলমান। এমনই মগের মুলুক চলছে এখন পাকিস্তানে। যত্রতত্র সংখ্যালঘুদের অপহরণ করে নির্মম অত্যাচারের পর তাদের ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিও থেকে জানা গেছে এই খবর। ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন নবিদ ইকবাল। অভিযোগ, নবিদের স্ত্রী সাইমা ইকবালকে অপহরণ করে খলিদ গতি নামে এক ব্যক্তি। দীর্ঘদিন তাকে বন্দি করে অকথ্য অত্যাচার চালাবার পর তাকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হয়। উল্লেখ্য, নবিদ এবং সাইমা মুসলমান হবার আগে খ্রিস্টান ছিলেন। সম্প্রতি কয়েকটি হিন্দু পরিবারকেও ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

‘কাশ্মীর’ রাজনীতি করতে গিয়ে বিপাকে আনন্দবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৬ মার্চ বিকেল পাঁচটা নাগাদ অনলাইন আনন্দবাজার পত্রিকায় আপলোড হলো একটি খবর— ‘আবারও চমকে উঠল কলকাতা, কাশ্মীরি শালওয়ালার পেটে ছুরি মেরে টাকা লুট’। বিস্তারিত খবর পড়তে গিয়েই তিরিক্ষি হয়ে উঠল আমজনতার মেজাজ। সংবাদে জানা যায় কলকাতার সন্তোষপুর নিবাসী জনৈক কাশ্মীরি শালওয়ালা সফুর আহমেদ শাহ পার্কসার্কাসে নির্জন রেললাইন ধরে যাওয়ার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী কাশ্মীরি এই অজুহাতে তার টাকার ব্যাগ লুঠ করে ইত্যাদি। খবরটি সুকৌশলে মুন্সিয়ানার সঙ্গে এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছিল যাতে করে ‘জাতীয়তাবাদীদের হাতে আবার আক্রান্ত কাশ্মীরিরা’ এই জাতীয় আওয়াজ আরও জোরদার হয়। মঞ্চ ভালোই সাজানো ছিল, কিন্তু প্রতিবেদক খেয়াল করে দেখলেন না পার্কসার্কাসে রেললাইনের ধারের বস্তি মোটামুটি ছিনতাইকারীদের দখলে এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বস্তি তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলমান। কোনও তথাকথিত ‘জাতীয়তাবাদী’র খেয়েদেয়ে দায় পড়েনি পার্কসার্কাসে কোনও কাশ্মীরিকে আক্রমণ করবে। শাণিত কটাক্ষ শুরু হলো আমজনতার। আনন্দবাজারকে কেউ লিখল : ‘আর কত দালালি করবেন পাকিস্তানের।’ কেউ বা লিখল : ‘ভারত-কাশ্মীর বিভাজনের রাজনীতি আর কতদিন।’ আবার কারোর প্রশ্ন : ‘আততায়ীর নাম জানাতে সাহস পাচ্ছেন না নাকি।’

অনলাইন সংস্করণ আনন্দবাজারের লজ্জা তখনও নেই। পরের দিনের পত্রিকায় দুপুর দেড়টা নাগাদ সম্পাদক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর-সম্পাদকীয় কলামে অতি মনোজ্ঞ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো : ‘সেই লজ্জাজনক অন্ধকারটা ঘিরে ধরছে অতি দেশেপ্রেমকে’। পাঠককুলের কটাক্ষ শুরু হলো আবার। দু’দিনই আহত কাশ্মীরি শালওয়ালা ছবি দিয়ে জনগণের সমবেদনা আদায়ের চেষ্টা ছিল। এর মধ্যে আবার প্রথম দিন তার পায়ে ছুরির কোপের দৃশ্যও ছিল। আনন্দবাজার অনলাইন সংস্করণের এই হাল দেখে ততক্ষণে আনন্দবাজারের মুদ্রিত সংস্করণ অবশ্য বেশ সামলে নিয়েছে বিষয়টি। ‘আক্রান্ত কাশ্মীর’, ‘কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ’-এর উগ্র প্রচারকেরা এমন মহার্ঘ্য খবরটিকে প্রথম পাতা থেকে সরিয়ে ১৭ মার্চের পত্রিকায় ভেতরের দিকে এক কোণায় ঠেলে দিয়েছেন।

‘কাশ্মীরি’ হিসেবে আক্রান্ত হওয়ার গল্পটিও যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাস্তবের মাটিতে পা দিয়ে হামলাকারীরা যে ‘জাতীয়তাবাদী’ হতে পারে না তাও জানিয়ে দিয়েছে। মজার কথা, হামলাকারীদের নামগুলি প্রকাশের সাহস কোনও সংবাদমাধ্যমেই ঘটনার অন্তত ৭২ ঘণ্টা পরেও জানাতে পারেনি। ‘নানা’ বলে একজনের গ্রেপ্তারির খবর লিখেছে। এমনই নাম যে তার জাত-ধর্ম বোঝা দায়। দুষ্কৃতীদের জাত-ধর্ম হয় না বটে, তবে ‘কাশ্মীরি’ যখন আক্রান্ত, দুষ্কৃতীদের জাত-ধর্ম না জানলে কী চলে! অন্তত তাতে ‘জাতীয়তাবাদে’র চরিত্রটি বোঝা যেত!

হরিহরদা চলে গেলেন

গত ১১ মার্চ সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক হরিহর নন্দ (হরিহরদা) ভোর ৩-১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি ওড়িয়া সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রদীপে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি, লেখক ও বলিষ্ঠ সংগঠক। ওড়িয়া, বাংলা, হিন্দী বিভিন্ন ভাষায় দখল ছিল তাঁর। তিনি ওড়িশা প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক ও প্রান্ত কার্যবাহ হিসাবে কাজ করেছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে চলে গেলেন। ১২ মার্চ সারাদিন 'উৎকল বিপন্ন সমিতি' ভবনে দেহ রাখা হয়েছিল সেখানে অগণিত স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ী শেষ শ্রদ্ধা জানান। শেষ সময়ে ভাইঝি ও জামাই উপস্থিত ছিলেন। ১৩ মার্চ সকালে বালেশ্বরের নিকট জন্মস্থানে (বল্লাপাতি গ্রাম) নিয়ে যাওয়া হয় ও দাহ সংস্কার করা হয়।

শ্রী নন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি ও এলএলবি পাশ করেন। পরে ওকালতি না করে সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং কটক জেলা প্রচারক নিযুক্ত হন। বেশ কিছুদিন জেলা প্রচারক হিসাবে কাজ করার পর 'রাষ্ট্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন (১৯৭৪ পর্যন্ত)। পরে ওড়িশা প্রান্তের প্রান্ত কার্যবাহ হন। সেই সময় ওড়িশা প্রান্তের সাংগঠনিক ও আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তবুও প্রান্ত সঙ্ঘচালক স্বর্গত ভূপেন কুমার বসুর নেতৃত্বে প্রান্ত প্রচারক স্বর্গত বাবুরাও পালধিকর-এর সহযোগিতায় সবকিছু বাস্তবায়িত করেছেন। ১৯৭৫-এ আর এস এস প্রতিবন্ধ হওয়ায় শ্রীনন্দ ভূমিগত থেকে সমগ্র উৎকল প্রান্তে স্বয়ংসেবকদের উৎসাহিত করেন এবং সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। পরে বাবুরাওজী ক্ষেত্র প্রচারক হয়ে কলকাতা চলে গেলে তিনি প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পান। প্রকৃতপক্ষে উৎকল প্রান্তে সঙ্ঘের বর্তমান

সাংগঠনিক কাঠামো তারই সৃষ্টি। পরবর্তীকালে আগ্নেয় ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ (উৎকল, অন্ধ্র), পূর্বক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ, অখিল ভারতীয় সংযোজক (হিন্দু জাগরণ মঞ্চ) ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু তাই নয় শেষদিন পর্যন্ত ওড়িশার কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। প্রয়াত শেষাদ্রীজীর লেখা 'Bunch of thoughts'-এর ওড়িয়া ভাষায় দুই খণ্ডে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, মিষ্টি ভাষণ সবাইকে মুগ্ধ করত। স্বয়ংসেবকদের আত্মত্যাগের কাহিনি-নির্ভর 'না ফুল চড়ে না দীপ জ্বলে' বইটির অনুবাদ করেছিলেন ওড়িয়া ভাষায়। নাম দিয়েছিলেন' আপুজা দায়ান'। গ্রন্থটি আজও ওড়িয়া ভাষায় অনুদিত সব থেকে অনুপ্রেরণাদায়ী সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া রচনা করেছিলেন 'দেশরা হত্যা,' 'মোপলা' এবং 'সঙ্ঘ পরিচয়ে'র মতো গ্রন্থ। অনুবাদ করেছিলেন বাবাসাহেব আপ্তের 'দশাবতার', ভাউসাহেব বাসকুটের 'লোকসংগ্রহ' এবং দত্তপন্ত ঠেংড়ির 'সঙ্ঘ বিবিধ ক্ষেত্র এবং ত্রিবিধ পাঠ্য'। অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন। 'মা নর্মদে' শীর্ষক গ্রন্থটির কাজ শেষ করে গেলেও এখনও প্রকাশিত হয়নি। সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ গোপালপ্রসাদ মহাপাত্র, উৎকল পূর্বপ্রান্ত সঙ্ঘচালক সমীর কুমার মহান্তী, সহ-প্রান্ত কার্যবাহ সুদর্শন দাশ এবং অসংখ্য স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ী হরিহর নন্দের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন।

শোকসংবাদ

গত ৬ মার্চ সকালে দক্ষিণপুর জেলার বালুরঘাট নগরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক বর্তমানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সহ-সম্পাদক অপূর্ব চক্রবর্তীর মাতৃদেবী জ্যোৎস্না চক্রবর্তী বিশ্বাসপাড়ার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি ৪ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহ-প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্টের মাতৃদেবী বন্দনবহন ভট্ট গত ৮ মার্চ গুজরাটের কর্ণাবতীতে তাঁর বড়দা মিলন ভাইয়ের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি তিন পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার উত্তর দমদম শাখার স্বয়ংসেবক গোপাল গুহ মজুমদারের মাতৃদেবী ছবিরানি গুহ মজুমদার গত ২ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাগুইআটি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা সংস্কারভারতী বাগুইআটি শাখার সহ-সভাপতি শশাঙ্কশেখর রায় (শ্যামলদা) গত ১৪ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৫২ সালে মানিকতলা শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিলেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

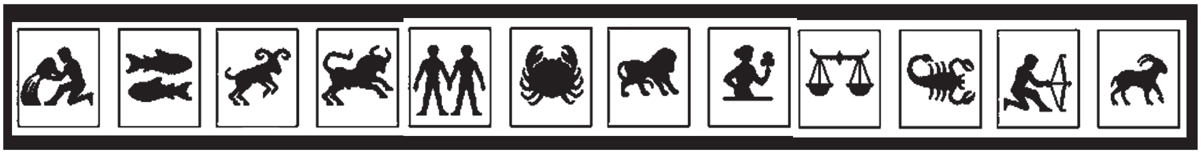

২৫ মার্চ (সোমবার) থেকে ৩১ মার্চ (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে মঙ্গল, মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে কেতু, কুম্ভে-মীনে রবি। শুক্রবার বুধ মার্গী রূপ পরিগ্রহ করছে এবং ওইদিন সন্ধ্যা ৫-৫৪ মিনিটে বৃহস্পতির ধনুতে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে বিশাখা নক্ষত্র থেকে মকরে শ্রাবণা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়বৃদ্ধি। প্রতিবেশী ও সহোদরের কোনও বিতর্কে সাবধানতা দরকার। সন্তান-সন্ততির পড়াশুনা, জ্ঞান, বাগ্মীতায় প্রতিষ্ঠা, সম্মান লাভ। শল্যচিকিৎসক, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার মেকানিকাল প্রযুক্তিবিদের কর্মজনিত দক্ষতা ও শংসালাভ। সপ্তাহের শেষভাগে পারিবারিক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও বাড়িতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

বৃষ ঃ হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি, তবে ব্লাডসুগার, নার্ভ ও প্রেসার সংক্রান্ত সচেতনতা অবলম্বন জরুরি। পেশাদারদের কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় থাকবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কথাবার্তায় শান্ত-সংযত থাকা ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুভ। বিলাসদ্রব্য ও রমণীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। নিজ পছন্দের সঙ্গে বিবাহ স্থির।

মিথুন ঃ স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি দূর করুন। শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ভোজনপটু, শৌখিনতা, নৃত্য, গায়ক, অভিনেতার নিজ পেশায় সাফল্যের অনেক পালক যুক্ত হবে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভ, সন্তানের চঞ্চলতায় মানসিক উদ্বেগ। কর্মস্থানে বিজাতীয় সংস্পর্শে উন্নতি।

কর্কট ঃ বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যে বিকশিত অন্তর ও প্রত্যয় বিত্ত-আভিজাত্য গৌরব প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও ক্রমবর্ধমান উন্নতি। জ্বর, ট্রাইফয়েড ও শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। প্রমোটিং, দালালি ব্যবসা, পুলিশ, সামরিক, ক্রীড়াবিদের ও স্বাধীন পেশায় নিযুক্তদের ব্যস্ততার মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও আত্মীয় মেলবন্ধনে মানসিক প্রশান্তি।

সিংহ ঃ যুবক মিত্র ও রমণীর কুহক থেকে সাবধান। পারিবারিক পরিবেশ। মাতার স্বাস্থ্য মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ। সঙ্গে পরিশ্রমাধিক্য ও ক্লান্তি। সন্তান-সন্ততির সন্তান যোগ। বিদ্যার্থীর মানসিক অস্থিরতা ও ক্ষুদ্র ও অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিকুল সময়। কর্ম সংক্রান্ত অর্থ বকেয়া পাওনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল।

কন্যা ঃ গৃহকর্তা ও জীবনসাথীর যৌথ বুদ্ধিমত্তায় ভাগ্যোন্নতির সফল প্রয়াস। প্রতিবেশীর সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি ও সহোদরের কর্মলাভের সম্ভাবনা। পরিচিত ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির কারণ হবে। প্রকাশনা, ওষুধ, সুগন্ধি ও শৌখিন দ্রব্য, বস্ত্র, অলংকার ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ ও প্রসার। জনকল্যাণে সক্রিয়তা ও সুহৃদের সান্নিধ্যলাভ।

তুলা ঃ কর্মস্থানে উদ্বেগে মানসিক অবসাদ হলে গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর কৃপালাভ। সঙ্গীত কলাবিদ্যায় শিল্পীদের পারদর্শিতা, স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি। স্নায়ুরোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি ও দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা। আর্থিক লেন-দেন বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

বৃশ্চিক ঃ কর্মস্থানে মানসিক চাপ ও আর্থিক প্রতারণা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। ভুল সিদ্ধান্তে অনুশোচনা তবে সন্তানের কর্মফল ও সফল বিবাহ যোগ। হারানো দ্রব্যের পুনরুদ্ধার ও ভালো কাজের সহায়ক। ছিদ্রান্বেষী শত্রুর কাছ থেকে দূরে থাকুন।

ধনু ঃ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, অনুভবী, ন্যায়পরায়ণতায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সু-সম্পর্ক, সমাজ সহায়তায় নিযুক্ত, গৃহ, বাহন, মাতৃসুখ তবে ব্যয় বাহুল্যের চাপ বর্তমান থাকবে। গৃহকর্তা ও গৃহশ্রী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। নির্মাণ শিল্প, খনিজ অনুসন্ধান, কূটনীতিজ্ঞদের কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি তবে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলা সুখকর।

মকর ঃ কর্মক্ষেত্রে বকেয়া কাজ নিয়ে উদ্বেগ। অগ্রজ ভ্রাতার পদোন্নতি। সুহৃদের বিনিয়োগের পরামর্শ কৌশলে এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অনভিপ্রেত ব্যবহারে শান্ত, সংযত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ, অন্যথায় আইনি জটিলতা। প্রেমজ ব্যাপারে অর্থ ও সময়ের অভাব।

কুম্ভ ঃ কর্মক্ষেত্রে বিলম্বিত উন্নতি। জীবনসাথীর নামে অংশীদারি ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য ও সাংসারিক সমৃদ্ধির সূচক। গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল কর্মে, সাফল্য, আর্থিক বিষয়ে একাধিক যোগাযোগের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জনে মনঃসংযোগ দরকার।

মীন ঃ স্বীয় প্রতিভায় প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান। চলচ্চিত্র, কলাকুশলী, চিত্রকর, ভাস্কর্য শিল্পীদের কাজের প্রসারতা বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। বাঁকা পথে উপার্জনের চিন্তা পারিবারিক অশান্তির কারণ। প্রেমজ ব্যাপারে নেতিবাচক ফল। চোখ ও ত্বকের চিকিৎসার প্রয়োজন। মায়ের শরীরের যত্ন নিন।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

শ্রী আচার্য্য